খাদ্য ও জীবন

ইউনিট ১

ভূমিকা

খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। শুধু মানুষ কেন খাদ্য ছাড়া কোন জীবই জীবনধারণ করতে পারে না। জীবনধারণের অনিবার্য উপাদান হলো-খাদ্য। মানবদেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, তাপ ও কর্মশক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি সব কাজই সংঘটিত হয় খাদ্য গ্রহণের ফলে। একেক ধরনের খাদ্য দেহে একেক ধরনের কাজ করে। তাই দেহকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখতে হলে সব ধরনের খাদ্য দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমাণমত গ্রহণ করতে হয়। খাদ্য তথা খাদ্য উপাদানসমূহের পরিমাণ ও গুণাগুণের উপর আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নির্ভর করে। এ কারণে, খাদ্যের গুণাগুণ বজায় রেখে খাদ্য সংরক্ষণ করাও জরুরী। খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হলে সঠিকভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে। বর্তমান বিশ্বে মাদকদ্রব্য সুস্বাস্থ্যের জন্য অন্যতম হুমকিস্বরূপ দেখা দিয়েছে। যুগের উন্মাদনায় এবং সহজপ্রাপ্যতার কারণে কোমলমতি কিশোর-কিশোরীসহ বিভিন্ন বয়সের জনগণ মাদকদ্রব্যের থাবা থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। অতএব, এর ক্ষতিকর প্রভাব ও পরিণতি সম্পর্কে জেনে মাদক গ্রহণের বিরুদ্ধে সচেতন থাকাটাও আমাদের শিখতে হবে। তা না হলে, এইডস এর মত মারাত্মক জীবন বিনাশকারী রোগ হতে সমাজকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর জীবনের অন্যতম উপায় হলো-শরীরচর্চা। শরীরচর্চা একাধারে আমাদের শরীর ও মনকে সতেজ, প্রফুল্ল, আত্মবিশ্বাসী ও কর্মঠ করে তোলে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ -১.১ : খাদ্য ও পুষ্টি
পাঠ -১.২ : আমিষ বা প্রোটিন
পাঠ -১.৩ : শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট
পাঠ -১.৪ : স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট
পাঠ -১.৫ : ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ
পাঠ -১.৬ : খনিজ লবণ বা মিনারেল ও পানি
পাঠ -১.৭ : শারীরিক সুস্থতা রক্ষায় সুষম খাদ্য
পাঠ -১.৮ : খাদ্য সংরক্ষণ
পাঠ -১.৯ : মাদকদ্রব্য ও এর প্রভাব
পাঠ -১.১০ : এইডস ও স্বাস্থ্যরক্ষায় শরীরচর্চা

পাঠ-১.১ খাদ্য ও পুষ্টি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খাদ্য কী তা জানতে পারবেন;
- খাদ্যের সাধারণ কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;
- খাদ্য উপাদানসমূহের নাম উল্লেখ করতে পারবেন;
- পুষ্টি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	খাদ্য, পুষ্টি, খাদ্য উপাদান, অণুখাদ্য, প্রধান খাদ্য

খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না একথা আমরা সবাই জানি। আমরা যা খাই তাকে আমরা খাদ্য বলে থাকি। কিন্তু আমরা যা খাই তার সবই খাদ্য নয়। যেসব বস্তু খাওয়ার পর দেহের অভ্যন্তরে হজম ও বিশেষিত হয়ে গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি কাজ করে দেহকে সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম রাখে তাকে খাদ্য বলে। অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হজম হয়ে রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে বিশোষিত হয়ে দেহের বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে। খাদ্য গ্রহণের ফলেই আমরা বড় হই, চলে ফিরে বেড়াই, কাজ করি এবং সর্বপরি বেঁচে থাকি। খাদ্য গ্রহণের ফলে আমাদের পুষ্টি সাধন হয়। আমরা নানা ধরনের খাদ্য খাই, যেমন ভাত, রুটি, ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, শাক-সবজি, ফল-মূল, চা, পানি ইত্যাদি।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, যা আহার করলে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হজম ও শোষণ হয়ে দেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধসহ বিভিন্ন ধরনের কাজ করে দেহকে সুস্থ, সবল ও সচল রাখে তাকে খাদ্য বলে। আমরা নানা ধরনের স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ ও ঘনত্বের খাদ্য গ্রহণ করি, যেমন ভাত, মাছ, ডিম, দুধ, শাক-সবজি, ফল, পানি ইত্যাদি।

পুষ্টি (Nutrition)

আমরা আগেই জেনেছি যে, খাদ্য আমাদের পুষ্টিসাধন করে থাকে। সাধারণভাবে পুষ্টি বলতে আমরা উন্নত গুণাগুণসম্পন্ন খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য রক্ষাকে বুঝে থাকি। ধারণাটি পুরোপুরি সঠিক নয়। আসলে, পুষ্টি হলো একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া। পুষ্টি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমেই খাদ্য দেহের চাহিদা পূরণ করে।

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য আহারের পর হজম হয়ে রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত ও শোষিত হয়ে দেহের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করে তাকে পুষ্টি বলে। পুষ্টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানবদেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ তাপ ও শক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধসহ যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন হয়। ফলে আমরা সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম থেকে জীবনধারণ করতে পারি।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখা যাচ্ছে যে, খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়দুটি গভীরভাবে জড়িত। কারণ, খাদ্য গ্রহণের ফলে দেহের পুষ্টিসাধন হয়। আবার, পুষ্টির অভাবে শারীরিক ও মানষিক বৃদ্ধি বাঁধাগ্রস্থ হয়।

খাদ্যের সাধারণ কাজ

খাদ্য মানবদেহের জন্য বহুবিধ কাজ করে থাকে। এসব কাজকে সাধারণভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা:

১) দেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা
২) দেহের জন্য তাপ ও শক্তি উৎপাদন করা
৩) দেহের রোগ প্রতিরোধ করা।

খাদ্য উপাদান

খাদ্যের যেসব জৈব ও অজৈব উপাদান দেহের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে তাদের খাদ্য উপাদান বা Nutrients বলে। দেহের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য উপাদান প্রয়োজন হয়। খাদ্য উপাদান ৬টি যথা :

১। আমিষ বা প্রোটিন
২। শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট
৩। স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট
৪। ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ
৫। খনিজ লবণ বা মিনারেল
৬। পানি

আমিষ, শর্করা ও স্নেহ পদার্থকে খাদ্যের প্রধান বা মূল উপাদান (Macro nutrients) বলা হয়। কারণ, এ উপাদানগুলো মানবদেহে অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয়। ভিটামিন ও খনিজ লবণকে সহায়ক খাদ্য উপাদান বা অণুখাদ্য (Micro Nutrients) বলা হয়। কারণ, এ খাদ্য উপাদানগুলো মানবদেহে অতি অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়। যেকোনো খাদ্য উপদানই প্রয়োজনের তুলনায় কম বা বেশি পরিমাণে গ্রহণ করলে শারীরিক জটিলতা ও অসুস্থতা দেখা দেয়। খাদ্য উপাদান পানি জীবনধারণের অত্যবশ্যকীয় উপাদান কারণ দেহের ৭০ শতাংশই পানি।

শিক্ষার্থীর কাজ	খাদ্য আমাদের জন্য অপরিহার্য - ব্যাখ্যা করুন।

সারাংশ

যা আহার করলে হজম ও বিশোষণ হয়ে দেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি করে দেহকে সুস্থ্য, সবল ও কর্মক্ষম রাখে তাকে খাদ্য বলে। যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যবস্তু আহারের পর রক্তের মাধ্যমে শোষিত হয়ে দেহের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করে তাকে পুষ্টি বলে। খাদ্য সাধারণভাবে আমাদের দেহে তিন ধরনের কাজ করে থাকে- (১) গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ (২) তাপ ও কর্মশক্তি উৎপাদন (৩) রোগ প্রতিরোধ। খাদ্য উপাদান ছয়টি, যথা: আমিষ, শর্করা, স্নেহ পদার্থ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি। দেহের সুস্থতার জন্য এ ছয়টি খাদ্য উপাদানই কম বেশি প্রয়োজনীয় পরিমাণে গ্রহণ করা অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পুষ্টি বলতে কী বোঝায়?
ক) বিভিন্ন খাদ্য উপাদান খ) একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া
গ) সুস্বাস্থ্য ঘ) দেহের চাহিদা পূরণ

২। খাদ্যের সাধারণ কাজ হলো-
i) দেহের গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ
ii) তাপ ও শক্তি উৎপাদন
iii) রোগ প্রতিরোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। প্রধান বা মূল খাদ্য উপাদান কোনগুলো?
ক) আমিষ, শর্করা ও ভিটামিন খ) শর্করা, ভিটামিন ও পানি
গ) আমিষ, শর্করা ও স্নেহ পদার্থ ঘ) শর্করা, ভিটামিন ও খনিজ লবণ

৪। কোনটি খাদ্য নয়?
ক) যা দেহে হজম ও শোষিত হয়
খ) আমরা যা কিছুই খাই
গ) যা দেহের চাহিদা পূরণ করে
ঘ) যা আহারের পর পুষ্টি সাধন হয়

পাঠ-১.২ আমিষ বা প্রোটিন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আমিষের গঠন উপাদান বলতে পারবেন;
- অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিডের নাম উল্লেখ করতে পারবেন;
- উৎস অনুসারে আমিষের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- আমিষ জাতীয় খাদ্যের কাজ ও দৈনিক চাহিদা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আমিষ বা প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড, অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড

আমিষের গঠন

আমিষ বা প্রোটিনের গঠন উপাদান হলো- কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H_2), অক্সিজেন (O_2) এবং নাইট্রোজেন (N_2)। আমিষে ১৬% নাইট্রোজেন থাকে। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মৌল সমন্বয়ে আমিষ বা প্রোটিনের গঠন একক অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হয়। একাধিক অ্যামাইনো অ্যাসিড মিলিত হয়ে পলিপেপটাইড ও পরিশেষে প্রোটিন গঠিত হয়। তাই প্রোটিনের রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলে বিভিন্ন ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। অর্থাৎ, পরিপাকের পর আমিষ বা প্রোটিন অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয়। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ডাল, মটরশুঁটি শিমেরবিচি, সয়াবিন, বাদাম ইত্যাদি আমিষ জাতীয় খাদ্য। এসব খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আমিষ পাওয়া যায়।

অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড

প্রোটিন গঠনকারী অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে ৮টি অ্যামাইনো অ্যাসিড মানবদেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। এরা দেহে তৈরি হতে পারে না। বিশেষ বিশেষ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য হতে এসমস্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো মানবদেহে সরবরাহ করতে হয়। এদের অত্যাবশ্যক বা অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড বলে। এ ৮টি অত্যাবশ্যকীয় অ্যাসিডগুলো হলো-

১। লাইসিন
২। লিউসিন
৩। আইসোলিউসিন
৪। মিথিওনিন
৫। ট্রিপটোফ্যান
৬। ভ্যালিন
৭। ফিনাইল অ্যালানিন
৮। থ্রিওনিন

দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, ছানা ইত্যাদিতে প্রায় সবকটি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায়।

আমিষের উৎস

উৎস অনুসারে আমিষ দুই প্রকার-

১। প্রাণিজ আমিষ
২। উদ্ভিজ্জ আমিষ

প্রাণি হতে প্রাপ্ত আমিষকে প্রাণিজ আমিষ বলে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা, পনির ইত্যাদি প্রাণিজ আমিষ। উদ্ভিদ হতে প্রাপ্ত আমিষকে উদ্ভিজ্জ আমিষ বলে। ডাল, শিমের বিচি, মটরশুঁটি, ভুট্টা, সয়াবিন, বাদাম ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ আমিষের উদাহরণ।

আমিষের কাজ

১। দেহ কোষ ও পেশি গঠন
২। ক্ষয়পূরণ
৩। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি
৪। দেহকে এডিমা (শরীরে পানি জমা) হতে রক্ষা করা।

আমিষের চাহিদা

প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে দৈনিক প্রোটিন চাহিদা হলো- প্রতি কিলোগ্রাম দেহ ওজনের জন্য ১ গ্রাম। অর্থাৎ ৬০ কিলোগ্রাম ওজনবিশিষ্ট কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক নারী বা পুরুষের দৈহিক প্রোটিন চাহিদা হবে ৬০ গ্রাম। শিশু ও বাড়ন্ত বয়সের বালক বালিকা ও কিশোর কিশোরীদের জন্য এ চাহিদা অনেক বেশি হয়। এক্ষেত্রে প্রোটিন চাহিদা প্রতি কিলোমিটার দেহ ওজনের জন্য ২-৩ গ্রাম পর্যন্তহয়ে থাকে। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে প্রোটিন চাহিদা প্রতি কিলোগ্রাম দেহ ওজনের জন্য ২-৩ গ্রাম পর্যন্তহতে পারে। শারীরিক শ্রমভেদে প্রোটিন চাহিদা কমবেশি হয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার দৈহিক ওজন ও বয়স অনুসারে প্রোটিনের চাহিদা দৈনিক কত হওয়া উচিত বলে মনে করেন? বুঝিয়ে দিন।

সারাংশ

খাদ্য উপাদানসমূহের মধ্যে আমিষ বা প্রোটিন অন্যতম যা কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন সমন্বয়ে গঠিত হয়। আমিষের গঠন একক হলো অ্যামাইনো অ্যাসিড একাধিক অ্যামাইনো অ্যাসিড মিলিত হয়ে প্রোটিন গঠিত হয়। লাইসিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন, মিথিওনিন, ট্রিপটোফ্যান, ভ্যালিন, ফিনাইল অ্যালানিন ও থ্রিওনিন এ ৮টি অ্যামাইনো অ্যাসিডকে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড বলা হয়। উৎস অনুসারে প্রোটিন ২ প্রকার-(১) প্রাণিজ প্রোটিন ও (২) উদ্ভিজ্জ প্রোটিন। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা, পনির, ডাল, বাদাম, শিমের বিচি, সয়াবিন, মটরশুঁটি ইত্যাদি প্রোটিনের ভালো উৎস। দেহকোষ ও পেশি গঠন, ক্ষয়পূরণ, দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি ইত্যাদি প্রোটিনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি। শারীরিক অবস্থা বয়স, ও শ্রমভেদে মানবদেহে প্রোটিনের দৈনিক চাহিদা বিভিন্ন ধরনের হয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের তুলনায় শিশু, বাড়ন্তবয়সের বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, গর্ভবর্তী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের প্রোটিন চাহিদা বেশি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রোটিনের গঠন উপাদান কোনগুলো?
ক) হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন
খ) কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন
গ) কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন
ঘ) কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন

২। প্রাণিজ প্রোটিনের উদাহরণ হলো-
i) দুধ ও ডিম
ii) সয়াবিন ও বাদাম
iii) ছানা ও পনির
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। মানবদেহে প্রোটিনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো-
i) দেহ কোষ গঠন ও ক্ষয়পূরণ
ii) তাপ ও শক্তি উৎপাদন
iii) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। আমিষের গঠন একক কোনটি?
ক) অ্যামাইনো অ্যাসিড
খ) নাইট্রোজেন
গ) কার্বন
ঘ) অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড

পাঠ-১.৩ শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শর্করা বা কার্বোহাইড্রেটের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন;
- উৎস অনুসারে শর্করার প্রকারভেদ বলতে পারবেন;
- শর্করা জাতীয় খাদ্যের কাজ উল্লেখ করতে পারবেন;
- মানবদেহে শর্করার দৈনিক চাহিদা নির্দেশ করতে পারবেন;
- অতিরিক্ত শর্করা গ্রহণের কুফল সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট, এক শর্করা, দ্বি-শর্করা, বহু শর্করা, ক্যালরি, কিলোক্যালরি

শর্করার গঠন

শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট হলো-মানবদেহের কর্মশক্তি ও তাপশক্তির প্রধান উৎস। মানুষের প্রধান খাদ্য শর্করা। কার্বন (C) হাইড্রোজেন (H_2) ও অক্সিজেন (O_2) নিয়ে শর্করার যৌগ গঠিত হয়। এটি মিষ্টি স্বাদযুক্ত এবং গন্ধ ও বর্ণহীন।

শর্করার উৎস

কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা প্রাণি এবং উদ্ভিদ উভয় ধরনের উৎস থেকেই পাওয়া যায়। উদ্ভিদ হতে প্রাপ্ত শর্করাগুলো হলো- চিনি, মধু, মিষ্টি ফল (আম, আঙ্গুর, কলা, কাঠাল, খেজুর ইত্যাদি), আখের রস, গুড়, খেজুরের রস, চাল, গম, ভুট্টা, আলু, কচু ইত্যাদি। প্রাণি হতে প্রাপ্ত শর্করার ভালো উৎস হলো- দুধের শর্করা, প্রাণিদেহের যকৃত ও পেশিকোষের শর্করা।

শর্করার প্রকারভেদ

গঠন অনুসারে শর্করা তিন প্রকার যথা : এক শর্করা (মনোস্যাকারাইড), দ্বি-শর্করা (ডাইস্যাকারাইড) ও বহু শর্করা (পলিস্যাকারাইড)।

১। এক শর্করা : এক শর্করাগুলো হলো- গ্লুকোজ, ফ্রক্টোজ ও গ্যালাক্টোজ
   ক) গ্লুকোজ-চিনি, মিষ্টি ফল ইত্যাদি
   খ) ফ্রুক্টোজ-মধু আঙ্গুর, বেদানা, আপেল, পাকা আম, পাকা কলা ইত্যাদি
   গ) গ্যালাক্টোজ-দুধের শর্করা ল্যাক্টোজ ভেঙ্গে গ্যালাক্টোজ ও গ্লুকোজ পাওয়া যায়।

২। দ্বি-শর্করা : দ্বি-শর্করাগুলো হলো- সুক্রোজ, মলটোজ ও ল্যাক্টেজ
   ক) সুক্রোজ-আখের চিনি, গুড়, খেজুর রস
   খ) মলটোজ-চালের শর্করা (দু'টি গ্লুকোজের অণু একত্রে)
   গ) ল্যাক্টোজ-দুধের শর্করা।

৩। বহু শর্করা : বহু শর্করাগুলো হলো- শ্বেতসার, গ্লাইকোজেন ও সেলুলোজ
   ক) শ্বেতসার-চাল, গম, আলু, কচু
   খ) সেলুলোজ-ফল ও শাক পাতার আঁশ, আঁশযুক্ত ফল, শস্যের খোসা
   গ) গ্লাইকোজেন-প্রাণিদেহের যকৃত ও পেশিতে পাওয়া যায়।

শর্করার কাজ

১। দেহের প্রয়োজনীয় তাপ উৎপন্ন করা
২। শক্তি যোগান দেয়া
৩। প্রোট্রিনের অপচয় রোধ করা
৪। বিপাকীয় কাজে প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করা
৫। সেলুলোজ নামক আঁশযুক্ত শর্করা দেহের অপাচ্য পদার্থ বের করতে ও কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করতে সাহায্য করে।

শর্করার চাহিদা

পুষ্টিবিদগণের মতে মানুষের দৈনিক ক্যালরি চাহিদার ৫৫-৬০% কার্বোহাইডেট জাতীয় খাদ্য হতে নেয়া প্রয়োজন। পরিশ্রমভেদে এর তারতম্য হতে পারে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, প্রতি কিলোগ্রাম দেহওজনের জন্য ৪-৬ গ্রাম শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। সে হিসেবে স্বাভাবিক ওজনের পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ন্যূনতম ৩০০ গ্রাম শর্করা জাতীয় খাদ্য আহার করা উচিত। যেহেতু ১ গ্রাম শর্করা হতে প্রায় ৪ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়, তাই ৩০০ গ্রাম শর্করা হতে ১২০০ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যাবে।

ক্যালরি

কর্মশক্তি পরিমাপের একক হলো ক্যালরি। পুষ্টিবিজ্ঞানে খাদ্য হতে উৎপন্ন তাপ বা শক্তি ক্যালরি দিয়ে পরিমাপ করা হয়। আমরা জানি যে ১০০০ ক্যালরি = ১ কিলোক্যালরি। এ হিসাবে আমাদের দেহের শক্তি চাহিদাও কিলোক্যালরি দিয়ে নির্ণয় করা হয়।

খাদ্য উপাদানগুলোর মধ্যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট হতে উল্লেখযোগ্য ও যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়।
১ গ্রাম প্রোটিন হতে ৪ কিলোক্যালরি (প্রায়) শক্তি পাওয়া যায়
১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট হতে ৪ কিলোক্যালরি (প্রায়) শক্তি পাওয়া যায়
১ গ্রাম তেল বা চর্বি হতে ৯ কিলোক্যালরি (প্রায়) শক্তি পাওয়া যায়।

অতিরিক্ত শর্করা গ্রহণের কুফল

প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে শর্করা গ্রহণ করলে তা দেহে মেদরূপে জমা হয়। পরিণামে স্থূলতা ও বহুমূত্র (ডায়াবেটিস) রোগ দেখা দিতে পারে। এছাড়া উচ্চরক্তচাপ ও হৃদরোগের আশংকা বাড়ে।

শিক্ষার্থীর কাজ	গঠন অনুসারে শর্করার প্রকারভেদ একটি চার্টের মাধ্যমে প্রকাশ করুন।

সারাংশ

কার্বোহাইড্রেট মানুষের প্রধান খাদ্য উপাদান। এটি দেহের তাপ ও শক্তির মূল উৎস। কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এ তিনটি মৌলিক উপাদান দিয়ে শর্করা যৌগ গঠিত হয়। গঠন অনুসারে শর্করা তিন প্রকার- এক শর্করা, দ্বি শর্করা ও বহু শর্করা। গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, গ্যালাইক্টোজ, সুক্রোজ, মলটোজ, ল্যাক্টোজ, শ্বেতসার, গ্লাইকোজেন ও সেলুলুজ বিভিন্ন প্রকার শর্করার নাম। শর্করা জাতীয় খাদ্যের ভালো উৎস হলো-ভাত, রুটি, ভুট্টা, চিনি, মধু, গুড়, পাকা ফল , আলু, খেজুর, আখ, আঙ্গুর, কলা, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি। দেহের জন্য তাপ ও শক্তি উৎপাদন করাই শর্করার প্রধান কাজ। এছাড়া সেলুলোজ অপাচ্য অংশ দেহ হতে বের হতে সাহায্য করে। পুষ্টিগণের মতে, দৈনিক ক্যালরি চাহিদার ৫৫-৬০% শর্করা জাতীয় খাদ্য হতে পূরণ করা উচিত। পুষ্টিবিজ্ঞানে খাদ্য হতে প্রাপ্ত দেহের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি পরিমাপের গ্রহণীয় একক হলো-কিলোক্যালরি। অতিরিক্ত কিলোক্যালরি তথা শর্করা গ্রহণ করার ফলে স্থূলতা, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগের মত অসুস্থতা দেখা দিতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শর্করার গঠনে কোন মৌলিক উপাদানগুলো থাকে?

ক) কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন
খ) কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন
গ) কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন
ঘ) হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন

২। কোনটি এক শর্করা?

ক) সুক্রোজ
খ) গ্যালাক্টোজ
গ) ল্যাক্টোজ
ঘ) গ্লাইকোজেন

৩। সেলুলোজের কাজ হলো-

i) অপাচ্য পদার্থ দেহ হতে বের করে দিতে সাহায্য করা
ii) অধিক পরিমাণে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করা
iii) কোষ্ঠ্যকাঠিন্য রোধ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii গ) i ও iii ঘ) iii

৪। দৈনিক শক্তি চাহিদার কত অংশ শর্করা জাতীয় খাদ্য হতে গ্রহণ করা উচিত?

ক) ৩০-৪০%
খ) ৪০-৪৫%
গ) ৪৫-৫৫%
ঘ) ৫৫-৬০%

পাঠ-১.৪ স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্নেহ পদার্থের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন;
- স্নেহ পদার্থের উৎস উল্লেখ করতে পারবেন;
- স্নেহ পদার্থের কাজ বলতে পারবেন;
- দেহে স্নেহ পদার্থের চাহিদা নির্দেশ করতে পারবেন;
- স্নেহ পদার্থের অভাবজনিত অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট, তেল, চর্বি, অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড, সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড।

স্নেহ পদার্থের গঠন

তেল ও চর্বি জাতীয় খাদ্য উপাদানকে স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট বলা হয়। ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলের সমন্বয়ে স্নেহ পদার্থে গঠিত। ফ্যাটি অ্যাসিডেরবৈশিষ্ট্যের উপর স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাটের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। খাদ্যে প্রায় ২০ ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যায়। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় কঠিন স্নেহ পদার্থগুলোকে চর্বি বলে। যেমন-মাছ ও মাংসের চর্বি। চর্বি হলো সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল স্নেহ পদার্থকে তেল বলে। যেমন সয়াবিন তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি। তেলগুলো অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড। তেল ও চর্বি অর্থাৎ স্নেহ পদার্থ দেহের প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তির ভালো উৎস। ১ গ্রাম স্নেহ পদার্থ হতে প্রায় ৯ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। খাদ্য উপাদানগুলোর মধ্যে শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফ্যাটই সর্বোচ্চ।

স্নেহ পদার্থের শ্রেণিবিভাগ : উৎস অনুযায়ী স্নেহ পদার্থ দুই প্রকার

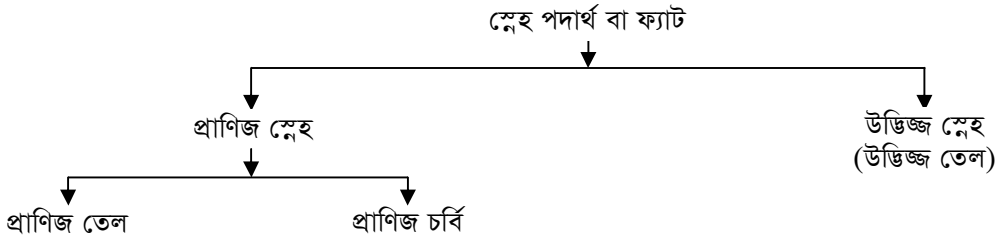

উপরের ছক থেকে দেখা যাচ্ছে যে, খাদ্য হতে প্রাপ্ত স্নেহ পদার্থকে তিনটি দলে ভাগ করা যায়।
প্রাণিজ তেল-যে কোনো মাছের তেল ও যকৃতের তেল।
প্রাণিজ চর্বি - মাংসের চর্বি, মাছের চর্বি, ঘি, মাখন ডিমের কুসুম, পানির ইত্যাদি।
উদ্ভিদ তেল-সয়াবিন, সরিষা, নারিকেল, তিল, ভুট্টা, বিভিন্ন বাদাম, পাম, তিসি, সূর্যমুখী ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত তেল।

স্নেহ পদার্থের কাজ

১। স্নেহ পদর্থের প্রধান কাজ দেহে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করা।
২। স্নেহ পদার্থ দেহের তাপমাত্রা বজায় রাখে।
৩। দেহে সঞ্চিত হয়ে ভবিষ্যতের খাদ্য ভান্ডার হিসেবে কাজ করে।
৪। ত্বকের মসৃণতা ও উজ্জ্বলতা বজায় রাখে।
৫। চর্মরোগ প্রতিরোধ করে।
৬। স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন-এ, ডি, ই এবং কে শোষণে ফ্যাট সাহায্য করে।

স্নেহ পদার্থের অভাবজনিত অবস্থা

দেহে স্নেহ পদার্থের অভাবে চর্মরোগ, ত্বক শুষ্ক ও খসখসে হওয়া, একজিমা ইত্যাদি হতে পারে। দীর্ঘদিন স্নেহ পদার্থের ঘাটতি হলে দেহে সঞ্চিত প্রোটিনের ক্ষয় হয়। এতে ওজন হ্রাস হয় ও স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

অধিক ফ্যাট গ্রহণের কুফল

অতিরিক্ত স্নেহ জাতীয় পদার্থ গ্রহণ করলে স্থূলতা, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ ও রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ইত্যাদি অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে।

স্নেহ পদার্থের চাহিদা

শিশুদের ও বাড়ন্তবয়সে খাদ্যে অধিক পরিমাণে ফ্যাট থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রাপ্ত বয়স্কেদের ক্ষেত্রে দৈনিক ক্যালরি চাহিদার ১০%-১৫% স্নেহ পদার্থ হতে পূরণ করা উচিত। খাদ্যে ন্যূনতম ১৫ গ্রাম প্রাণিজ ও ৫-১০ গ্রাম উদ্ভিজ্জ ফ্যাট থাকা প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্নেহ পদার্থের অভাবজনিত ও আধিক্যজনিত শারীরিক অবস্থার বিবরণ দিন।

সারাংশ

গি□সারল নামক রাসায়নিক যৌগ এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের সমন্বয়ে স্নেহ পদার্থ গঠিত হয়। খাদ্যে প্রায় ২০ ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিড দেখতে পাওয়া যায়। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় কঠিন স্নেহ পদার্থগুলোকে চর্বি এবং তরল স্নেহ পদার্থকে তেল বলে। চর্বি সম্পৃক্ত এবং তেল অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড। ফ্যাটি অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্যের উপর স্নেহ পদার্থের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। মাছ ও মাংসের চর্বিগুলো চর্বিজাতীয় ও বিভিন্ন ধরনের তেলগুলো তেলজাতীয় স্নেহ পদার্থ। ১ গ্রাম স্নেহ পদার্থ হতে ৯ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়। উৎস অনুযায়ী স্নেহ পদার্থ ২ প্রকার-১। প্রাণিজ স্নেহ ও ২। উদ্ভিজ্জ স্নেহ। স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাটের প্রধান কাজ তাপ ও শক্তি উৎপাদন। ত্বকের মসৃণতা বজায় রাখতে ও চর্মরোগ প্রতিরোধে ফ্যাট কাজ করে। অতিরিক্ত ফ্যাট গ্রহণের ফলে স্থূলতা, রক্ত সঞ্চালনে বিঘ্ন, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্ত চাপ, হৃদরোগ ইত্যাদি হতে পারে। প্রাপ্ত বয়স্কদের তুলনায় শিশু ও বাড়ন্তবয়সে দেহে স্নেহ পদার্থের প্রয়োজন বেশি থাকে। প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে দৈনিক শক্তি চাহিদার ন্যূনতম ১০%-১৫% স্নেহ পদার্থ হতে পূরণ করা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট বিশ্লেষণ করলে কী পাওয়া যায়?
ক) গি□সারল ও ফ্যাটি অ্যাসিড খ) গি□সারল ও তেল
গ) ফ্যাটি অ্যাসিড ও চর্বি ঘ) গি□সারল ও লবণ

২। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তেল কেমন থাকে?
ক) কঠিন খ) তরল গ) অর্ধতরল ঘ) দানাদার

৩। ১ গ্রাম ফ্যাট হতে কত কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়?
ক) ৪ কিলোক্যালরি খ) ৬ কিলোক্যালরি
গ) ৯ কিলোক্যালরি ঘ) ১ কিলোক্যালরি

৪। স্নেহ পদার্থের কাজ হলো-
i) তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করা
ii) ত্বকের মসৃণতা বজায় রাখা
iii) চর্মরোগ প্রতিরোধ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৫ ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভিটামিনের প্রকারভেদ বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনের উৎস উল্লেখ করতে পারবেন;
- ভিটামিনের কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;
- ভিটামিনের অভাবজনিত অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ভিটামিনের চাহিদা নির্দেশ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ, পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন, স্নেহের দ্রবণীয় ভিটামিন

ভিটামিন একটি জৈব রাসায়নিক উপাদান যা দেহে খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়। কিন্তএর অভাবে দেহের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়। ভিটামিন খাদ্যে অতি সামান্য পরিমাণে থেকে শর্করা, আমিষ, চর্বি জাতীয় খাদ্য বিপাকে সাহায্য করে। তাই মানবদেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য ভিটামিন অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান।

ভিটামিনের প্রকারভেদ

দ্রবণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে ভিটামিনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন- ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স ও ভিটামিন-সি

২। স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন-এ, ভিটিামিন-ডি, ভিটামিন-ই এবং ভিটামিন-কে

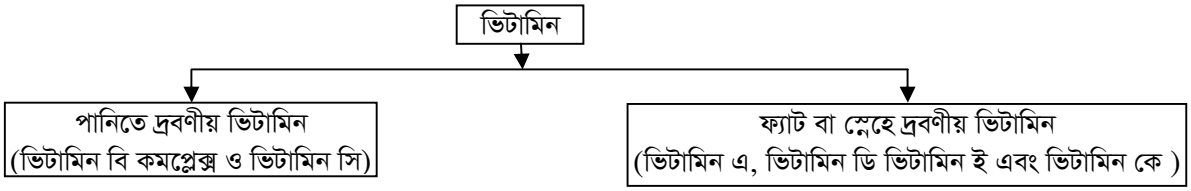

১। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন

পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো হলো ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স ও ভিটামিন-সি। ১২টি বি ভিটামিনকে একত্রে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বলা হয়। ভিটামিন-বি কমপ্লেক্সের মধ্যে ভিটামিন বি ১ (থায়ামিন), ভিটামিন বি২ (রিবোফ্লাভিন), ভিটামিন বি৫ (নিয়ামিন), ভিটামিন বি ৬ (পিরিডক্সন), ভিটামিন বি ১২ (কোবলামিন) গুরুত্বপূর্ণ। দেহের স্বাভাবিক সুস্থতা, বৃদ্ধি, স্নায়ু ও মস্তিষ্কের কাজ, বিপাক, প্রজনন ইত্যাদি কাজে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আবশ্যক। ভিটামিন সি, বা অ্যাসকরবিক অ্যাসিডকে স্কার্ভি প্রতিরোধক ভিটামিন বলে।

থায়ামিন বা ভিটামিন বি ১

উৎস : ঢেঁকি ছাঁটা চাল, সিদ্ধ ধানের চাল, গম, অংকুরিত ছোলা, মটরশুঁটি, চীনাবাদাম, যব, ঈস্ট, চালের কুঁড়া ইত্যাদি থায়ামিনের ভালো উৎস।

অভাবজনিত অবস্থা : দীর্ঘদিন থায়ামিনের অভাবে বেরি বেরি রোগ দেখা দেয়। এছাড়া স্নায়ুর দুর্বলতা, অরুচি, মানসিক অবসাদ, ক্লান্তিইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়।

দৈনিক চাহিদা : শিশুদের ০.৫-০.৭ মিলিগ্রাম, বড়দের ১.২-১.৫ মিলিগ্রাম এবং গর্ভবতী মায়েদের ১.৫-১.৭ মিলিগ্রাম।

রিবোফ্লাভিন বা ভিটামিন বি ২

উৎস : কমলা ও হলুদ বর্ণের শাকসবজি যেমন মিষ্টি কুমড়া, পাকা পেঁপে, কুমড়োর ফুল, ডিমের কুসুম, দুধ, বাদাম, যকৃত রিবোফ্লাভিনের ভালো উৎস।

অভাবজনিত অবস্থা : এর অভাবে জিহ্বায়, ঠোঁটের কোণায় ও মুখের ভিতরে ঘা দেখা দেয়। ত্বক খসখসে হয়ে যায়।

দৈনিক চাহিদা : প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের দৈনিক ১.৭ মিলিগ্রাম ও নারীর ১.৩ মিলিগ্রাম প্রয়োজন। শিশুদের দৈনিক ০.৮ মিলিগ্রাম এবং কিশোর কিশোরীদের যথাক্রমে ২.০ মিলিগ্রাম ও ১.৩ মিলিগ্রাম প্রয়োজন। ভিটামিন বি ২ অভাবে মুখে ঘা হতে পারে।

নিয়াসিন বা ভিটামিন বি ৫

উৎস : মাংস, কলিজা, গম বা আটা, ডাল, বাদাম, তৈলবীজ, ছোলা ইত্যাদি নিয়াসিনের ভালো উৎস।

অভাবজনিত অবস্থা : এর অভাবে পেলেগ্রা রোগ হয়। ফলে, ত্বকে লালচে দাগ পড়ে ও খসখসে হয়ে যায়।

দৈনিক চাহিদা : প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের ১৮ কিলোগ্রাম, নারীর ১৩ মি. গ্রাম, গর্ভবর্তী মায়ের ১৫ মি. গ্রাম এবং প্রসূতি মাতার ১৮ মি. গ্রাম রিবোফ্লাভিন প্রয়োজন হয়।

পিরিডক্সিন বা ভিটামিন বি ৬

উৎস : চাল, আটা, মাছ, মাংস, শাক-সবজি, ছোলা, ডিমের কুসুম ইত্যাদি।

অভাবজনিত অবস্থা : এর অভাবে অরুচি, বমিভাব ও রক্তশূন্যতা বা অ্যানিমিয়া দেখা দেয়।

দৈনিক চাহিদা : প্রাপ্ত বয়স্কদের চাহিদা দৈনিক ১.৪-২.০ মি. গ্রাম।

কোবালামিন বা ভিটামিন বি ১২

উৎস : কলিজা, দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, পনির ইত্যাদি।

অভাবজনিত অবস্থা : এর অভাবে রক্তশূন্যতা হয় ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষয় সাধিত হয়।

দৈনিক চাহিদা : প্রাপ্ত বয়স্কদের দৈনিক ৪-৮ মি. গ্রাম প্রয়োজন হয়।

ভিটামিন সি বা অ্যাসকরবিক অ্যাসিড

উৎস : ভিটামিন সি টক স্বাদ বিশিষ্ট। টাটকা শাকসবজি ও ফলে ভিটামিন সি থাকে। আমলকি, লেবু, কমলালেবু, পেয়ারা, কাঁচা, মরিচ, লেটুস পাতা, পুদিনা পাতা, ধনে পাতা, টমেটো, আনারস, কামরাঙা, বাতাবি লেবু ইত্যাদি ভিটামিন সি এর ভালো উৎস। শুকনা ফল ও টিনজাত খাদ্যে ভিটামিন সি থাকে না।

কাজ : ১। দাঁতের মাড়ি সুস্থ রাখে
২। ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল রাখে
৩। ক্ষতস্থান দ্রুত পুনর্গঠন করে
৪। সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করে
৫। আমিষ ও স্নেহ পদার্থ বিপাকে সাহায্য করে

অভাবজনিত অবস্থা : দীর্ঘদিন ধরে এর অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়, ত্বকে ঘা হয়, ক্ষত শুকাতে দেরি হয়। দাঁত দুর্বল হয়ে অকালে ঝরে পড়ে, অস্থির গঠন মজবুত হয় না, রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায় ও সহজে ঠান্ডা লাগে। এছাড়া চুল পড়ে ও অরুচি হয়।

দৈনিক চাহিদা : দৈনিক শিশুদের ২০ মি. গ্রাম, প্রাপ্ত বয়স্কদের ৩০ মি. গ্রাম এবং গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের ৫০-৬০ মি. গ্রাম ভিটামিন সি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২। স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন

ভিটামিন-এ, ডি, ই ও কে স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন। এসব ভিটামিন কেবল ফ্যাটেই দ্রবীভূত হয়, পানিতে নয়।

ভিটামিন এ

উৎস : ভিটামিন এ এর ভালো প্রাণিজ উৎসগুলো হলে-ডিম, দুধ, ছানা, মাখন, ঘি, পনির, কলিজা, ও কড মাছের তেল। গাজর, মিষ্টিকুমড়া, পাকা আম, গাঢ় সবুজ শাক, পাকা পেঁপে, কাঁঠাল এবং লাল শাক, কচু শাক, পুঁই শাক, পাট শাক, কলমি শাক, ডাঁটা শাক, পুদিনা পাতা ইত্যাদি ভিটামিন এ এর উদ্ভিজ্জ উৎস।

কাজ

১। দৃষ্টি শক্তি ঠিক রাখে এবং রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে।

২। দাঁত ও অস্থি গঠনে সহায়তা করে

৩। দেহের বিভিন্ন আবরককলা যেমন- ত্বক, চোখের কর্ণিয়া, বৃক্ক ইত্যাদি স্বাভাবিক ও সজীব রাখে।

৪। রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।

অভাবজনিত অবস্থা : এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। দীর্ঘদিনের অভাবে ব্যক্তি পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ভিটামিন ডি

উৎস : সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে আমাদের ত্বকের নিচে কোলেস্টেরল নামক স্নেহ পদার্থ থেকে ভিটামিন ডি উৎপন্ন হয়। একমাত্র প্রাণিজ উৎস থেকেই এই ভিটামিন পাওয়া যায়। সামুদ্রিক মাছের তেল, যকৃত, প্রাণিজ তেল, চর্বি, ডিম, মাখন, ঘি ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়।

কাজ : হাঁড় ও দাঁত গঠনে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের কাজে সহায়তা করে।

অভাবজনিত অবস্থা : এর অভাবে দাঁত উঠতে দেরি হয়, অস্থি বা হাঁড় গঠন সুদৃঢ় হয় না। শিশুদের রিকেট রোগ হয়। শিশু বিকলাঙ্গ হতে পারে।

দৈনিক চাহিদা : ১-৫ বছরের শিশুদের ৪০০ আই.ইউ (I.U.)। প্রাপ্ত বয়স্ক ও অন্যান্য বয়সের ছেলে মেয়েদের ২০০ আই.ইউ এবং গর্ভবতী ও প্রসূতিমায়েদের ৪০০ আই. ইউ।

ভিটামিন ই

উৎস : বাদাম, অংকুরিত ছোলা, বীজ জাতীয় খাদ্য, পামতেল, সূর্যমুখী তেল, লেটুস পাতা ইত্যাদি ভিটামিন ই এর ভালো উৎস।

কাজ : এটি একটি এ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা ধমনীতে চর্বি জমা রোধ করে, ত্বক সুস্থ রাখে, সন্তান জন্মদান ক্ষমতা দেয়।

অভাবজনিত অবস্থা : এর অভাবে জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণের মৃত্যু হতে পারে।

দৈনিক চাহিদা : প্রাপ্ত বয়স্কদের দৈনিক ৫-১০ মিলিগ্রাম এবং শিশু কিশোরদের ১০-৩০ মিলিগ্রাম প্রয়োজন হয়।

ভিটামিন কে

উৎস : সবুজ শাক সবজি, বাঁধাকপি, লেটুস পাতা, ডিমের কুসুম, কলিজা, মাছ, মাংস-এর ভালো উৎস।

কাজ : রক্তপাত নিরাময়ে সাহায্য করে।

অভাবজনিত অবস্থা : এর অভাবে গর্ভবতী মহিলাদের রক্তপাত বেশি হয়।

দৈনিক চাহিদা : শিশুদের দৈনিক ২০ মাইক্রোগ্রাম, প্রাপ্ত বয়স্কদের ৪০ মাইক্রোগ্রাম এবং গর্ভবতীদের ১-২ মিলিগ্রাম প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর কাজ	পানিতে দ্রবণীয় এবং স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহের উৎস, কাজ, অভাবজনিত অবস্থা ও দৈনিক চাহিদা নির্দেশ করে একটি ছক প্রস্তুত করুন।

সারাংশ

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা দেহে অতি অল্প পরিমাণে উপস্থিত থেকে দেহের অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যাবলি সম্পন্ন, নিয়ন্ত্রণ ও সহায়তা করে। দ্রবণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে ভিটামিন দু'প্রকার যথা : ১) পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন ২) স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো হলো- ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, যেমন- থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, নিয়াসিন, পিরিডক্সিন, কোবালামিন ইত্যাদি এবং ভিটামিন সি বা অ্যাসকরবিক অ্যাসিড। স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো হলো-ভিটমিন এ, ডি, ই এবং কে। সাধারণভাবে ভিটামিন দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট বিপাকে সাহায্য করে। দেহের বৃদ্ধিতে ও সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভিটামিন কোন ধরনের পদার্থ?

ক) অজৈব যৌগ খ) জৈব রাসায়নিক পদার্থ

গ) অজৈব কঠিন পদার্থ ঘ) জৈব পদার্থ

২। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন হলো-

i) থায়ামিন

ii) ভিটামিন কে

iii) ভিটামিন সি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে কোন ভিটামিন?

ক) ভিটামিন এ খ) ভিটামিন বি

গ) ভিটামিন সি ঘ) ভিটামিন ডি

৪। ভিটামিন বি$_2$ বা রিবোফ্লাভিনের অভাবে কী হয়?

ক) অস্থি ও দাঁতের গঠন দুর্বল হয় খ) ক্ষতস্থান শুকাতে দেরি হয়

গ) রক্তশূন্যতা দেখা দেয় ঘ) ঠোঁটের কোণে ও জিহ্বার ঘা হয়

পাঠ-১.৬ খনিজ লবণ বা মিনারেল ও পানি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মানবদেহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খনিজ লবণের নাম বলতে পারবেন;
- খনিজ লবণসমূহের উৎস উল্লেখ করতে পারবেন;
- খনিজ লবণগুলোর গুরুত্বপূর্ণ কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;
- মানবদেহে খনিজ লবণের চাহিদা নির্দেশ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	খণিজ লবণ, লৌহ বা আয়রণ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়োডিন, পানি

দেহের কাঠামো গঠন ও প্রাণ রাসায়নিক ভূমিকা পালনের জন্য খনিজ লবণ অপরিহার্য। দেহের পুষ্টিগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ লবণ হলো-ক্যালসিয়াম, লৌহ, আয়োডিন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, জিংক বা দস্তা, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরিন ইত্যাদি। নিচে কয়েকটি খনিজ লবণের পুষ্টিগত তাৎপর্য আলোচনা করা হল। খনিজ লবণ কম বা বেশি হলে শরীরে নানা রকম জটিলতার সৃষ্টি হয়। বৃদ্ধকালে খনিজ লবণের ভারসাম্যহীনতা অসুস্থতার লক্ষণ।

লৌহ বা আয়রণ (Fe)

রক্তের অন্যতম প্রধান উপাদান লৌহ বা আয়রণ। প্রতি ১০০ মিলি রক্তের প্রায় ৫০ মিলি গ্রাম লৌহ থাকে। এছাড়া যকৃত, প্লিহা, অস্তিমজ্জায় লৌহ সঞ্চিত থাকে। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির দেহে বিদ্যমান ৩-৪ গ্রাম লৌহের চার ভাগের তিন ভাগই রক্তে থাকে।

উৎস : কাঁচা কলা, সবুজ শাক, কচু, শুকনো ফল, আপেল, কলা ইত্যাদি লৌহের উদ্ভিজ্জ উৎস। ডিমের কুসুম, কলিজা, মাছ, মাংস ইত্যাদি লৌহের প্রাণিজ উৎস।

কাজ : লৌহ রক্তের লোহিত কণিকা বা হিমোগ্লোবিন তৈরি করে, রক্তে অক্সিজেন বহন করে।

অভাবজনিত অবস্থা : লৌহের অভাবে রক্তস্বল্পতা বা রক্তশূন্যতা বা এনিমিয়া দেখা দেয়।

দৈনিক চাহিদা : প্রাপ্ত বয়স্কদের ১০ মিলিগ্রাম, কিশোরীদের ১২-১৫ মিলিগ্রাম। শিশুদের ১০ মিলিগ্রাম এবং গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের ১২-১৫ মিলিগ্রাম, লৌহ প্রয়োজন হয়।

ক্যালসিয়াম (Ca)

ক্যালসিয়াম অস্থি ও দাঁত গঠনের প্রধান উপাদান। দেহের ৯৯% ক্যালসিয়াম অস্থি ও দাঁত গঠনে কাজ করে। দেহ ওজনের ২% ক্যালসিয়াম। খনিজ পদার্থগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণই দেহে সর্বোচ্চ।

উৎস : দুধ, গরুর মাংস, ছোট মাছ, পনির, ডিম, দই, বাদাম, ফুলকপি, শাক-সবজি, কলিজা, খেজুর ইত্যাদি ক্যালসিয়ামের ভালো উৎস।

কাজ : অস্থি ও দাঁত গঠন করে, রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা করে, হৃৎপিন্ডের পেশির স্বাভাবিক সংকোচনে সাহায্য করে।

অভাবজনিত অবস্থা : শিশুদের রিকেট এবং বয়স্ক মহিলাদের অস্টিওম্যালেশিয়া রোগ হয়। এর অভাবে শিশুদের দাঁত উঠতে দেরি হয়।

দৈনিক চাহিদা : প্রাপ্ত বয়স্কদের চাহিদা প্রায় ১ গ্রাম, বাড়ন্তশিশুদের ০৫-১.৫ গ্রাম এবং গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের ১০-১.৫ গ্রাম।

ফসফরাস (P)

পরিমাণের দিক থেকে খনিজ লবণগুলোর মধ্যে দেহে ক্যালসিয়ামের পরই ফসফরাসের অবস্থান। অস্থি ও দাঁত গঠনে ফসফরাস ক্যালসিয়ামের সাথে কাজ করে। ফসফরাস অস্থি, যকৃৎ ও রক্ত রসে সঞ্চিত থাকে।

উৎস : শস্যদানা, শিম, বরবটি, মটরশুটি, বাদাম, ডিম, দুধ, মাছ মাংস, কলিজা ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস থাকে।

কাজ : ফসফরাস দাঁত ও অস্থি গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান। এটি শর্করা ও স্নেহ পদার্থ বিপাকে সাহায্য করে। নিউক্লিক অ্যাসিড ও নিউক্লিয় প্রোটিন গঠনে ভূমিকা রাখে।

অভাবজনিত অবস্থা : ফসফরাসের অভাবে রিকেটস রোগ, হাঁড় ও দাঁতের ক্ষয় হয়।

দৈনিক চাহিদা : প্রাপ্ত বয়স্কদের ১০ গ্রাম এবং শিশু ও বাড়ন্তদের ০.৫-১.৫ গ্রাম ফসফরাস প্রয়োজন হয়।

আয়োডিন (I)

দেহের ৬৫% আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন নামক হরমোন তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট আয়োডিন কোষে ও রক্তে সঞ্চিত থাকে।

উৎস : সামুদ্রিক মাছ, সমুদ্র উপকূলীয় শাকসবজি ও প্রাণিজ দুধ, কডলিভার তেল ইত্যাদি আয়োডিনের উৎস। বর্তমানে আয়োডিনের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে খাবার লবণের সাথে পরিমাণ মত আয়োডিন যুক্ত করে বাজারজাত করা হয়।

কাজ : থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন হরমোন তৈরি করে, মস্তিস্কের গঠন ঠিক রাখে, গর্ভাবস্থায় শিশুর বুদ্ধি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাহায্য করে ইত্যাদি।

অভাবজনিত অবস্থা : এর অভাবে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, শিশু খর্বাকায় হয়, শিশু অবস্থা হতেই বুদ্ধি বিকাশ বাঁধাগ্রস্থ হয়। থাইরয়েড গ্রন্থি বড় হয়ে গলগন্ড রোগ হয়।

দৈনিক চাহিদা : প্রাপ্ত বয়স্কদের ১০০-১৪০ মাইক্রোগ্রাম, শিশুদের ৬০-১০০ মাইক্রোগ্রাম, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের ১২৫-১৫০ মাইক্রোগ্রাম আয়োডিন প্রয়োজন হয়।

পানি

খাদ্যের অন্যতম উপাদান পানি মানবদেহের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য। দেহের অভ্যন্তরীণ কোনো কাজই পানির উপস্থিতি বা সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। পানির মাধ্যমে শরীর গঠনের প্রয়োজনীয় সব উপাদান দেহের সর্বত্র প্রবাহিত হয়। আমাদের দেহের ওজনের ৬০-৭০% ভাগই পানি।

উৎস : খাবার পানি, চা, দুধ, সরবত, রসাল ফল, শাক-সবজি ইত্যাদি পানির উৎস।

কাজ : পানি মূলত তিন ধরনের কাজে অংশ নেয়-

১। দেহ গঠন- নবজাতকের দেহের প্রায় ৭৭% এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রায় ৭০% পানি, রক্ত, মাংস, মস্তিষ্ক, যকৃত, ত্বক, কোষ ইত্যাদি প্রতিটি অঙ্গ গঠনের জন্য পানি প্রয়োজন।

২। দেহ অভ্যন্তরীণ কাজ- হজম, বিপাক, পরিপাক, শোষণ ইত্যাদি কাজে পানি প্রয়োজন।

৩। দেহ হতে দূষিত পদার্থ নির্গত করা- মূত্র, ঘাম, মল পানির মাধ্যমে নির্গত হয়।

অভাবজনিত অবস্থা : অতিরিক্ত কঠোর পরিশ্রম, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, অতিরিক্ত ঘাম, ডায়াবেটিস, বমি, কলেরা ইত্যাদি কারণে দেহে পানির অভাব দেখা দিতে পারে। এ অবস্থাকে পানিশূন্যতা বলে। এ অবস্থায় পিপাসা তীব্র হয়, ত্বক কুচকে যায়। এতে দেহকোষ শুকিয়ে যায়। দেহে পানির আধিক্য হলে শরীর ফুলে যায়, একে এডিমা বলে।

দৈনিক চাহিদা : একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ২-৩ লিটার পানি বা তরল পান করা উচিত। কারণ, প্রতিদিন ঘাম, মল, মূত্রের মাধ্যমে ঐ পরিমাণ পানি আমাদের দেহ হতে বের হয়ে যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	পানির অভাবে আমাদের দৈহিক অবস্থার বিবরণ দিন।

সারাংশ

খনিজ লবণ আমাদের দেহের জন্য অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান। খনিজ লবণগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধানগুলো হল- লৌহ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়োডিন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদি। লৌহের অভাবে রক্তশূন্যতা; ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাবে রিকেটস, হাঁড় ও দাঁতের গঠন বাঁধাগ্রস্থ; আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড, খর্বাকায় শিশু ইত্যাদি হতে পারে। পানি আমাদের জীবনের জন্য অপরিহার্য। আমাদের দেহের কার্য সম্পাদন ও নিয়ন্ত্রণ এবং দেহ হতে দূষিত পদার্থ নির্গত করা পানির গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন খনিজ লবণের অভাবে রক্তশূন্যতা হয়?
ক) লৌহ খ) ক্যালসিয়াম
গ) ফসফরাস ঘ) সোডিয়াম

২। ক্যালসিয়ামের কাজ কোনটি?
ক) রক্তের লোহিত কণিকা তৈরি করা
খ) হাঁড় ও দাঁত গঠন করা
গ) থাইরয়েড গ্রন্থি হতে থাইরয়েড হরমোন তৈরি করা
ঘ) দেহ হতে দূষিত পদার্থ বের করা

৩। আয়োডিনের অভাবে কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়?
ক) পানিশূন্যতা খ) এডিমা
গ) গলগন্ড ঘ) রিকেটস

৪। পানির কাজ হলো-
i) দেহের অভ্যন্তরীণ কার্যাদি সম্পাদনে অংশগ্রহণ করা
ii) দেহ হতে দূষিত পদার্থ নির্গত করা
iii) রক্তশূন্যতা দূর করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৭ শারীরিক সুস্থতা রক্ষায় সুষম খাদ্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সুষম খাদ্য বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- সুষম খাদ্যের মেনু পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- রাফেজ বা আঁশ এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- সুষম খাদ্য পিরামিড ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিএম আই বা দৈহিক ভরসূচি নির্ণয় করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সুষম খাদ্য, মেনু, রাফেজ, আঁশ, খাদ্য তালিকা, মৌলিক খাদ্য শ্রেণি, বিএমআই বা দেহের ভরসূচি

আমরা আগেই খাদ্যের উপাদানগুলোর সাথে পরিচিত হয়েছি। চাহিদার তুলনায় কম বা বেশি খাদ্য গ্রহণ- উভয়ই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকা এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ হয় এবং অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ পরিহার করা যায়। ব্যক্তি বিশেষের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পিত এ ধরনের খাদ্য সমাহারই সুষম খাদ্য।

সুষম খাদ্য

ব্যক্তির বয়স, লিঙ্গ, শ্রম ও শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে, খাদ্যের ছয়টি উপাদানের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ মিটিয়ে এবং ক্যালরি চাহিদা পূরণ করে যে খাদ্য পরিকল্পনা করা হয় তাকে সুষম খাদ্য বলে। অর্থাৎ, যেসব খাদ্য গ্রহণ করলে ব্যক্তি বিশেষের বয়স, লিঙ্গ, শ্রম অনুযায়ী তার প্রয়োজনীয় ক্যালরি ও খাদ্য উপাদানের চাহিদা পূরণ হয়ে সুস্বাস্থ্য বজায় থাকে তাকেই সুষম খাদ্য বা ব্যালেন্সেড ডায়েট (balanced diet) বলে।

এককভাবে কোনো খাদ্যই সুষম খাদ্য নয়। সুষম খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করে নিতে হয়।

উদাহরণস্বরূপ একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের দৈনিক ২৫০০-৩০০০ কিলোক্যালরি শক্তি পূরণ করতে হবে যাতে তার শক্তি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি খাদ্যের ছয়টি উপাদানের চাহিদাও পূরণ হয়। তবেই ঐ খাদ্য সামগ্রীকে ঐ ব্যক্তির জন্য সুষম খাদ্য বলা যাবে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সবার জন্য সুষম খাদ্যের ধরন বা প্রকৃতি এবং পরিমাণ এক হবে না। একেক জনের চাহিদা অনুসারে সুষম খাদ্য একেক ধরনের হবে। যেমন-শিশু ও বৃদ্ধদের খাদ্য সহজপাচ্য হবে। প্রাপ্ত বয়স্কদের খাদ্য তালিকায় চর্বিবর্জিত খাদ্য সন্নিবেশ করতে হবে। শিশু ও কিশোরদের খাদ্যে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম এবং শক্তির জন্য তুলনামূলকভাবে অধিক চর্বিযুক্ত খাদ্য থাকতে হবে। গর্ভবতী ও প্রসূতি বা দুগ্ধদানকারী মায়েদের খাদ্যে বাড়তি প্রোটিন, লৌহ, ক্যালসিয়াম, শর্করা প্রভৃতি থাকতে হবে। বৃদ্ধ বয়সের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ লবণসমৃদ্ধ খাদ্য থাকতে হবে ইত্যাদি। সেজন্য আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা প্রস্তুতের সময় সবার বিশেষ চাহিদার কথা বিবেচনা করেই খাদ্য তালিকা তৈরি করতে হবে।

আঁশ বা রাফেজ

আঁশ বা রাফেজ খাদ্য উপাদানের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি মূলত খাদ্যের মধ্যে থাকা দীর্ঘ তন্তুময় বা আঁশসদৃশ্য অংশ। উদ্ভিজ্জ খাদ্যের সেলুলোজ অংশই রাফেজ বা আঁশ। শাক-সবজি, খোসাসমেত টাটকা ফল, মটরশুঁটি, ধনিয়া, ডাল, শস্যবীজ ইত্যাদিতে রাজেফ বা আঁশ পাওয়া যায়। এটি আমাদের দেহে কোনো পুষ্টি যোগায় না। তবে, খাদ্যের মধ্যে অবস্থান করে অন্যান্য খাদ্যের সাথে গৃহীত হয় এবং সরাসরি খাদ্য নালির মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়ে অপরিপাককৃত অবস্থায় মলের সাথে নির্গত হয়। এটি কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়বেটিস, হৃদরোগ, স্থুলতা ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধ করে। রাফেজ বা আঁশ কোনো খাদ্য উপাদান না হলেও মানবদেহের জন্য অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান যা সুস্থ জীবনের জন্য অতি জরুরী। তাই, আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় অন্যান্য খাদ্য উপাদানের সাথে ২০-৩০ গ্রাম রাফেজ বা আঁশযুক্ত খাদ্যের উপস্থিতি থাকা প্রয়োজন।

রাফেজ বা আঁশের গুরুত্ব

১. খাদ্য পরিপাকের সাহায্য করে
২. পানি শোষণ করে মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে
৩. শরীর থেকে অপাচ্য বস্তু বের করে দিতে সাহায্য করে
৪. দেহের অতিরিক্ত চর্বি কমাতে সাহায্য করে
৫. মলাশয়ের ক্যান্সার, অর্শ, অ্যাপেন্ডিকস, পিত্তথলির রোগ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, স্থূলতা ইত্যাদি রোগ হ্রাসে সাহায্য করে।

মেনু বা খাদ্য তালিকা

পরিবারের সদস্যদের জন্য সুষম খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যরক্ষা ও চাহিদার কথা বিবেচনা করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে খাদ্য পরিকল্পনা করাকে মেনু বলে। অর্থাৎ, একটি পরিকল্পিত খাদ্য তালিকাই মেনু যা মূলত খাদ্য গ্রহণকারীর প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণে সক্ষম। পরিবারের সদস্যদের সুষম খাদ্য পরিবেশনের লক্ষ্যে মেনু পরিকল্পনা করা হয়।

মেনু পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়

১। বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক শ্রমের ধরন ও মাত্রা, পেশা, ইত্যাদি ভেদে চাহিদা ও রুচি ভিন্ন হয়। মেনু পরিকল্পনার সময় এসব বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

২। মেনু পরিকল্পনায় আবহাওয়া ও ঋতুর প্রভাব থাকে। মেনুতে সহজলভ্য মৌসুমী খাদ্যদ্রব্য অন্তর্ভুক্ত করে খাবারের স্বাদ ও পুষ্টিগুণের বৈচিত্র্য আনা যায়। এছাড়া, গ্রীষ্মকালে সহজপাচ্য, অধিক তরলযুক্ত খাদ্য গ্রহণ, শীতকালে তাপ প্রদানকারী স্নেহজাতীয় খাদ্যের সন্নিবেশ ঘটানো ইত্যাদি বিষয়গুলো লক্ষণীয়।

৩। মেনুতে দেহ গঠনকারী খাদ্য, যেমন- মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ডাল ইত্যাদি; শক্তি ও তাপ প্রদানকারী খাদ্য, যেমন- ভাত, রুটি, আলু, চিনি, গুড়, তেল, ঘি, মাখন ইত্যাদি এবং রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য, যেমন- শাক-সবজি ফল-মূল ইত্যাদি এবং পর্যাপ্ত পানি বা তরল আছে কিনা তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

৪। খাদ্য গ্রহণকারীর খাদ্যাভ্যাস ও রুচির প্রতি নজর দিতে হবে।

৫। সর্বপরি, খাদ্য গ্রহণকারীর জন্য মেনুর খাদ্যদ্রব্য সুষম খাদ্য হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে।

সুষম খাদ্য পিরামিড

আমরা জানলাম যে, একটি সুষম খাদ্য তালিকায় বা একটি আদর্শ মেনুতে শর্করা জাতীয় খাদ্য, আমিষ জাতীয় খাদ্য, স্নেহ পদার্থ, ভিটামিন, খনিজ লবণ, পানি বা তরল সব খাদ্য উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য। খাদ্য নির্বাচন এমন হতে হবে যাতে এসব খাদ্য হতে প্রয়োজনীয় রাফেজ বা আঁশ পাওয়া যায়। সুষম খাদ্যের তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এখানে প্রধানত চার ধরনের খাবার থাকে-শর্করা বা শক্তিদায়ক খাদ্য, শাক সবজি, ফলমূল বা রোগ

প্রতিরোধকারী খাদ্য, আমিষ বা দেহ গঠনকারী খাদ্য এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্য। পরিমাণের দিক থেকে সুষম খাদ্যে সর্বাধিক পরিমাণে শর্করা জাতীয় খাদ্য তাকে। এরপর শাক-সবজি ও ফলমূল। পরিমাণে তৃতীয় অবস্থানে থাকে আমিষ জাতীয় খাদ্য এবং সবচেয়ে কম পরিমাণে স্নেহ পদার্থ থাকে। শর্করাকে নিচে রেখে পরিমাণগতভাবে পর্যায়ক্রমে উপরের দিকে সাজালে একে সুষম খাদ্য পিরামিড বলে।

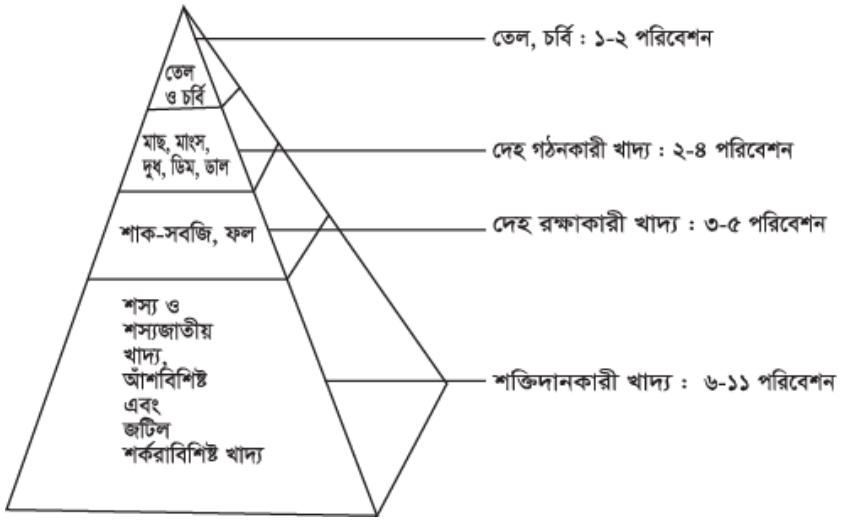

চিত্র ১.৭.১ : সুষম খাদ্য পিরামিড

সাধারণভাবে সবার জন্য খাদ্য নির্বাচনের সময় ক্যালরি প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত অনুপাতে খাদ্য পরিকল্পনা করা উচিত ১। প্রোটিন বা আমিষ : মোট ক্যালরির ১৫%। ২। শর্করা জাতীয় খাদ্য (চিনি জাতীয় খাদ্য ব্যতীত) : মোট ক্যালরির ৫০-৬০% ৩। স্নেহ পদার্থ : (ক) সম্পৃক্ত স্নেহ মোট ক্যালরির ৭% ও (খ) অসম্পৃক্ত স্নেহ ২০%।

মৌলিক খাদ্য শ্রেণি

পুষ্টিবিজ্ঞানীগণ আমাদের প্রতিদিনের আহার্য খাদ্যসমূহকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। তাদের মতে, সুষম খাদ্য পেতে হলে প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় এই চার শ্রেণির খাদ্য হতে খাদ্য নির্বাচন করতে হবে। এগুলো হলো-

১। মাংস, মাছ, ডিম, ডাল, বাদাম ইত্যাদি (আমিষ জাতীয় খাদ্য)
২। দুধ ও দুগ্ধজাতীয় খাদ্য, যেমন-পনির, দই, দুধ, ফিরনি ইত্যাদি।
৩। ফলমূল ও শাক-সবজি
৪। শস্য ও শস্যদানা জাতীয় খাদ্য, যেমন - ভাত, রুটি, ভুট্টা, যব, মুড়ি, চিড়া, (শর্করা জাতীয় খাদ্য)

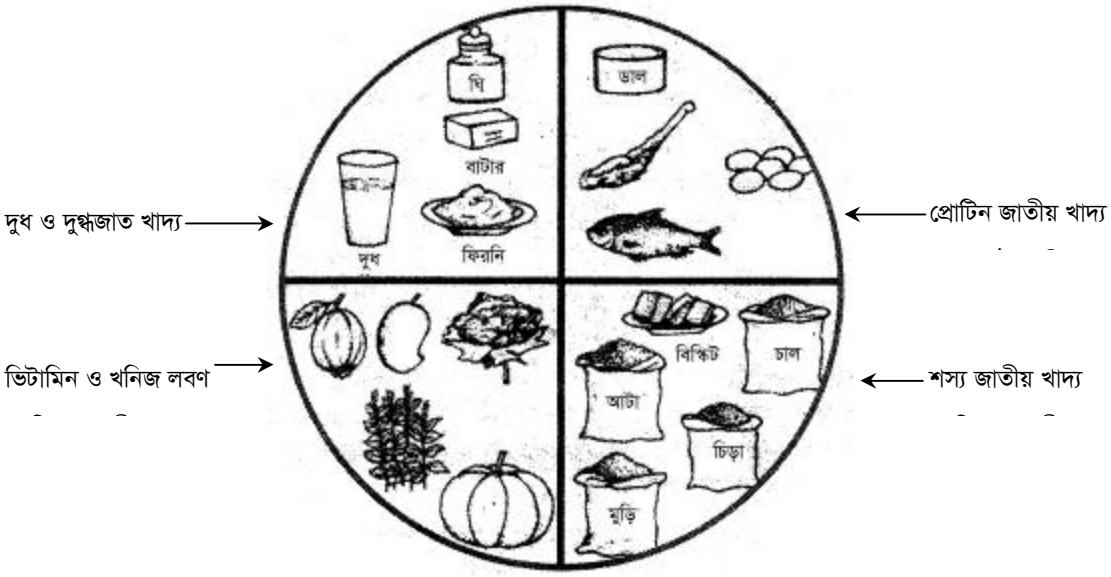

চিত্র ১.৭.২ : মৌলিক খাদ্য শ্রেণি

নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস

সুস্থ জীবনের জন্য নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস অত্যন্তজরুরী। শরীরের ক্ষতি সাধন করে এমন খাদ্যাভ্যাস পরিহার করে শরীরকে সতেজ রাখে তেমন খাদ্যাভ্যাস মেনে চলাকে নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস বলা যায়। নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে কয়েকটি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হলো-

১। সকালের চায়ের সাথে অবশ্যই হালকা খাবার গ্রহণ করা উচিত।

২। সকালের নাস্তায় রুটি, মাখন, ১টি ডিম ও ১টি কলা খেলে দৈনিক পুষ্টি চাহিদার গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করা সম্ভব।

৩। আমাদের দেশে যেহেতু দুপুরের খাদ্য একটি প্রধান খাদ্য, তাই এসময় সুষম খাদ্য তালিকা অনুসরণ করে খাদ্য বাছাই করা উচিত।

৪। অনেক সময় চাকরিজীবী ও শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবার সময় ও পরিমাণ ঠিক থাকে না। তাই, দুপুরের খাবারে কোনো ঘাটতি থাকলে বিকালের ভারী নাস্তা দিয়ে পূরণ করতে হবে।

৫। রাতের খাবার রাত ৮ টার মধ্যে গ্রহণ করা উচিত। এসময় সহজপাচ্য ও কম আমিষযুক্ত খাবার খাওয়া ভালো। রাতের খাবারে শাক ও টক জাতীয় খাদ্য পরিহার করে ঘুমানোর আগে দুধ বা দুধ জাতীয় তরল গ্রহণ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।

৬। এদেশের আবহাওয়ায় মাংসের বদলে মাছই শ্রেয়তর প্রোটিনের উৎস।

৭। ভারী খাবার শেষে টক দই অথবা ফল খাওয়া যেতে পারে।

৮। গরমের সময় সারাদিনে প্রচুর তরল, পানি, ফলমূল, শাকসবজি খাওয়া উচিত।

৯। উচ্চতাপে তেলে ভাজা ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড মুখোরোচক ও সুস্বাদু হলেও এগুলো শরীরের জন্য ভালো নয়। ফাস্ট ফুডে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ, উচ্চ মাত্রার প্রাণিজ চর্বি ও চিনি একে অস্বাস্থ্যকর করে তোলে। বার্গার, চিপস, কেক, পেস্ট্রি, কোলা, লেমন, পিজ্জা, প্যাটিস ইত্যাদিতে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে না এবং এসব আমাদের দাঁত ও ত্বকের জন্য ক্ষতিকর। ফাস্ট ফুড গ্রহণ স্থূলতাসহ নানা রকম জটিল রোগের কারণ হতে পারে।

১০।পানিবাহিত রোগ, ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, জন্ডিস, ইত্যাদি হতে রক্ষা পেতে হলে খোলা বা উন্মুক্ত স্থানে, রাস্তা ঘাটে প্রস্তুত খাবার খাওয়া হতে বিরত থাকা উচিত।

বিএমআই বা দেহের ভরসূচি

বিএমআই অর্থাৎ বডি ম্যাস ইনডেক্স (Body Mass Index) হলো প্রাপ্ত বয়স্ক নারী ও পুরুষের উচ্চতার সাথে দেহ ওজনের সামঞ্জস্য পরিমাপের সূচক। শৈশব ও কৈশোর পার হয়ে প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হলে, মানুষের উচ্চতার আর কোনো পরিবর্তন হয় না। তখন দেহকে সুস্থ, সবল, রোগমুক্ত রাখা ও ক্ষয়পূরণ করাই হয় খাদ্যের কাজ। তাই প্রাপ্ত বয়সে উচ্চতার সাথে দেহ ওজনের সামঞ্জস্য থাকলে তাকে শারীরিকভাবে সুস্থ বলা যায়। প্রাপ্ত বয়সে শারীরিক উচ্চতা ও ওজন অনুসারে সুস্থতা পরিমাপের নির্দেশক হলো বিএমআই।

বিএম আই (BMI) এর সূত্র হলো-

$\frac{\text{দেহ ওজন (কেজি)}}{\text{দৈনিক উচ্চতা (মিটার)}^২}$ বা, $\frac{\text{body weight in kg}}{(\text{hight in mitre})^2}$

অর্থাৎ, দেহের ওজনকে (কিলোগ্রামে প্রকাশিত) উচ্চতার (মিটারে প্রকাশিত) বর্গ দিয়ে ভাগ করলে BMI পাওয়া যাবে।

ধরা যাক, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর দৈহিক ওজন ৫৫ কেজি এবং উচ্চতা ১.৬ মিটার। তাহলে তার বিএমআই হবে।

$$\text{বিএমআই} = \frac{৫৫}{(১.৬)^2} = \frac{৫৫}{২.৫৬} = ২১.৫$$

সাধারণভাবে, ২০ হতে ২৬ এর মধ্যে বিএমআইকে সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ ধরা হয়। এ সীমার নিচে বিএমআই থাকলে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ এবং এর উপরে বিএমআই থাকলে দেহে চর্বির আধিক্য বা স্থূলতা বলে ধরা হয়। সেটিও স্বাস্থ্যের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার BIM পরিমাপ করে স্বাস্থ্যগত অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

সারাংশ

ব্যক্তির বয়স, লিঙ্গ, শ্রম, শারীরিক অবস্থাভেদে খাদ্যের ছয়টি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত দৈহিক চাহিদা পূরণকারী খাদ্য পরিকল্পনাকে সুষম খাদ্য বলা হয়। খাদ্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে খাদ্য উপাদানের পাশাপাশি খাদ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণে আঁশ বা রাফেজ থাকা জরুরী। কারণ রাফেজ শরীর সুস্থ রাখতে ও কিছু কিছু রোগ প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে। পরিবারের সদস্যদের জন্য সুষম খাদ্য নিশ্চিত করতে মেনু পরিকল্পনা করা হয়। মেনু পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো-বয়স, লিঙ্গ, শ্রমের মাত্রা ও ধরন, খাদ্যাভ্যাস, আবহাওয়া ও ঋতুর প্রভাব, দৈহিক চাহিদা, আর্থিক সামর্থ্য ইত্যাদি। খাদ্যের মৌলিক চারটি শ্রেণি জানা থাকলে প্রতিদিনের জন্য সুষম খাদ্য সমন্বয়ে মেনু প্রস্তুত করা সহজ ও যথার্থ হয়। স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা বজায় রাখতে হলে আমাদের অবশ্যই নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। শারীরকে সুস্থ রাখার জন্য দেহের উচ্চতা ও ওজনের সামঞ্জস্য বজায় রাখা জরুরী। শারীরিক উচ্চতা ও ওজনের সামঞ্জস্য পরিমাপের নির্দেশক হলো - বিএমআই (BMI) বা দৈহিক ভরসূচি। বিএমআই পরিমাপের সূত্র

$$= \frac{\text{কিলোগ্রামে প্রকাশিত দেহের ওজন}}{(\text{মিটারে প্রকাশিত দৈহিক উচ্চতা})^২}$$

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সুষম খাদ্য বলতে কী বোঝায়?
- ক) পুষ্টিকর খানা
- খ) বলবর্ধক খাদ্য
- গ) খাদ্যের ছয়টি উপাদান বিশিষ্ট খাদ্য সামগ্রী
- ঘ) দৈহিক চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমানে খাদ্য উপাদান সমন্বয় তৈরি খাদ্য

২। রাফেজ বা আঁশের কাজ হলো-
- i) খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করা
- ii) দেহ হতে অপাচ্য অংশ বের করে দিতে সাহায্য করা

iii) দেহের অতিরিক্ত চর্বি কমাতে সাহায্য করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
শাকিলা তার ওজন স্বাভাবিক রাখার জন্য পুষ্টিবিদের পরামর্শ মতে একটি খাদ্য তালিকা অনুসরণ করার সিদ্ধান্তনেন। নির্দেশনা অনুযায়ী খাদ্য নির্বাচনের সময় সে প্রায়শই অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

৩। শাকিলার দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য প্রয়োজন-
i) সুষম খাদ্য গ্রহণ
ii) রাফেজযুক্ত খাদ্য গ্রহণ
iii) কম চর্বি ও শর্করাযুক্ত খাদ্য গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। সুষম খাদ্য নির্বাচনের সময় শাকিলা কোনটির সাহায্য নেবেন?
ক) সুষম খাদ্য পিরামিড
খ) মৌলিক খাদ্য শ্রেণি
গ) সুষম খাদ্য পিরামিড ও মৌলিক খাদ্য শ্রেণি
ঘ) বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান

পাঠ-১.৮ খাদ্য সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খাদ্য সংরক্ষণ বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণ উল্লেখ করতে পারবেন;
- খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- খাদ্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থ অব্যবহারের কুফল বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	খাদ্য সংরক্ষণ, খাদ্যে বিষক্রিয়া, খাদ্য সংরক্ষক রাসায়নিক পদার্থ, খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি

যে কোনো দেশেই খাদ্য সংরক্ষণ করা একটি জনগুরুত্বপূর্ণ কাজ। খাদ্য মূল্য বজায় রেখে ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটানো, দুর্যোগকালীন চাহিদা মেটানো, বিদেশে রপ্তানি করা ইত্যাদি কারণে খাদ্যদ্রব্য দীর্ঘদিন স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মজুত করাকেই খাদ্য সংরক্ষণ বলে। অর্থাৎ, যথাযথ খাদ্যমূল্য বজায় রেখে প্রায় অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করাকেই খাদ্য সংরক্ষণ বলে।

খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণ

সব ধরনের খাদ্যই তার প্রকৃতি অনুযায়ী কম-বেশি সময়ের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। মূলত এ কারণেই খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণগুলো হলো-

১। জীবাণুর আক্রমণ (যেমন ছত্রাক বা বিভিন্ন অণুজীবের আক্রমণ)
২। খাদ্যের মধ্যে এনজাইম বা উৎসেচকের ক্রিয়া
৩। রাসায়নিক বিক্রিয়া

উপরের কারণগুলোকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের আর্দ্রতা, তাপ, অম্লের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়সমূহ ত্বরান্বিত করে। যেমন- আর্দ্রতা এনজাইমের কাজকে দ্রুত করে, বাতাসের উপস্থিতিতে অম্ল খাদ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় ইত্যাদি।

খাদ্যে বিষক্রিয়া (Food Poisoning)

ব্যাকটেরিয়া খাদ্য নষ্ট করে এক ধরনের বিষাক্ত উপাদান তৈরি করে। একে টক্সিন বলে। টক্সিন উপাদান দেহ অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে খাদ্যে বিষক্রিয়া বা Food Poisoning হয়ে মানুষের মৃত্যু পর্যন্তহতে পারে।

ঈস্টজাতীয় ছত্রাক জ্যাম, জেলি, ফলের রস, মিষ্টি আচার ইত্যাদি দ্রুত নষ্ট করে। এতে খাবার টক গন্ধ, ফেনাফেনা, ঘোলাটে হয়ে যায়।

মোলড জাতীয় ছত্রাক পাউরুটি, কমলালেবু, টমেটো পনির, টক আচার ইত্যাদি টকজাতীয় খাবার নষ্ট করে।

খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব

কিছু পচনশীল খাদ্য সংরক্ষণ না করলে অতি দ্রুতই নষ্ট হয়ে যায়। আবার, অপচনশীল খাদ্যও বেশ কিছুদিন পর খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যায়। তখন তা আর কোনো কাজে আসে না। এতে অর্থনৈতিক ও পুষ্টিগত ক্ষতি হয়। তাই খাদ্যসামগ্রী আহারযোগ্য রাখতে হলে বিজ্ঞানসম্মতভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করা উচিত। খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব বিশ্বস্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্রায়ই আলোচিত হয়। বিজ্ঞানসম্মতভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করলে-

১। জীবাণুর আক্রমণ হতে খাদ্যকে রক্ষা করা যায়।
২। খাদ্যের পুষ্টিমূল্য বজায় রাখা যায়।
৩। দুর্যোগ অবস্থায় খাদ্য সরবরাহ ঠিক রাখা যায়।
৪। বাড়তি খাদ্য রপ্তানি করে অর্থনৈতিক উন্নতি করা যায় ইত্যাদি।

খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি

যেসব প্রক্রিয়া বা কৌশল অবলম্বন করে খাদ্যকে বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করা হয় সেসব প্রক্রিয়াকে খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি বলে। বিভিন্ন প্রকার খাদ্য সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলো হলো-

১। তাপ প্রয়োগ
২। শুষ্ককরণ বা রোদে শুকানো
৩। রেফ্রিজারেশন
৪। বরফে জমানো বা ফ্রিজিং
৫। সংরক্ষক দ্রব্য প্রয়োগ
৬। চিনি ও লবণের দ্রবণে সংরক্ষণ

১। তাপ প্রয়োগ

তাপ প্রয়োগ করে পাস্তুরাইজেশন, স্ফুটন ইত্যাদি পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় ১০০° সেন্ট্রিগ্রেডের ঊর্ধ্বে তাপ প্রয়োগ করে অণুজীবের ক্রিয়া ধ্বংস করা হয়। দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদি অতি পচনশীল খাদ্য ২৪ ঘন্টা পর্যন্তসংরক্ষণ করা যায়।

২। রোদে শুকানো বা শুষ্ককরণ

প্রাচীনকাল থেকেই সূর্যের তাপে খাদ্যদ্রব্য শুকিয়ে সংরক্ষণ করার পদ্ধতি প্রচলিত। রোদের তাপে খাদ্যশস্য ও ফলমূলের জলীয় অংশ বাষ্পীভূত করে শুকিয়ে বোতলে, বোয়ামে বা কৌটাতে ভালো করে ঠেসে ভরে বাতাস বের করে সংরক্ষণ করা হয়। মাছ ও মাংসের ক্ষেত্রে ২০-২৫ দিন কড়া রোদে শুকানোর প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে রোদে দেয়া দরকার হতে পারে।

৩। রেফ্রিজারেশন

এ পদ্ধতিতে রেফ্রিজারেটরের মধ্যে কাঁচা শাক-সবজি, ফল, রান্না করা খাদ্য, মিষ্টি জাতীয় খাদ্য কিছুদিন পর্যন্তভালো রাখা যায়।

৪। বরফে জমানো বা ফ্রিজিং

এ পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্য বাড়িতে ব্যবহৃত ফ্রিজে বা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হিমাগারে সংরক্ষণ করা হয়। এভাবে টাটকা শাক- সবজি, ফল, ফলের রস, মাছ, মাংস, রান্না করা বা প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, আইসক্রিম, আলু, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি সংরক্ষণ করা যায়।

৫। সংরক্ষক দ্রব্য প্রয়োগ

খাদ্য সংরক্ষক রাসায়নিক পদার্থ বা Preservative প্রয়োগ করে খাদ্যকে পচন থেকে রক্ষা করা যায়। রাসায়নিক সংরক্ষক পদার্থ প্রয়োগের ফলে খাদ্যে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে না। আমাদের অতি পরিচিত কয়েকটি Prservative হলো- সিরকা বা ভিনেগার, সোডিয়াম, সোডিয়াম বেনজয়েট ইত্যাদি। আচার, চাটনি, সস প্রভৃতিতে ভিনেগার ব্যবহৃত হয়। ফলের রস সংরক্ষণের জন্য সোডিয়াম বেনজয়েট ব্যবহার করা হয়।

৬। চিনি ও লবণের দ্রবণে সংরক্ষণ

চিনি ও লবণের দ্রবণে খাদ্য সংরক্ষণ একটি বহুল ব্যবহৃত সংরক্ষণ পদ্ধতি। জ্যাম, জেলি, মারমালেড, আপেল, আনারস, পেয়ারা ইত্যাদি ফল টুকরা করে চিনির ঘন দ্রবণে বায়ুনিরোধী করে বহুদিন সংরক্ষণ করা যায়। লবণের দ্রবণ বা ব্রাইন-এও খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা হয়। যেমন- নোনা ইলিশ মাছ।

সতর্কতা

খাদ্যের স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্তন ঘটলে, খাদ্য ফুলে উঠলে, খাদ্যের উপরিভাগে সাদা অথবা কালো আস্তরণ পড়লে, খাদ্যে পিচ্ছিল ভাব হলে, খাদ্য ঘোলা হয়ে গেলে বুঝতে হবে খাদ্যে পচনক্রিয়া শুরু হয়েছে। এছাড়া পঁচা ও টক গন্ধ তৈরি হলেও এধরনের খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না। এতে শরীরিক ক্ষতি হবে।

খাদ্য সংরক্ষণে অপরিচিত রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়া

খাদ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের ঝুঁকি কোনোভাবেই কাম্য নয়। জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো কিছু খাদ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের যে কোনো পর্যায়ে প্রয়োগ করা অনৈতিক ও অবৈধ। কিন্তুআমাদের দেশে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অত্যন্তক্ষতিকর, বিষাক্ত পদার্থ খাদ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায় প্রয়োগ করে থাকেন যা দেশ, জাতি ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। এখানে খাদ্যে ব্যবহৃত কয়েকটি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

ফরমালিন : ফরমালিন খাদ্য সংরক্ষণের রাসায়নিক যৌগ নয়। ফরমালিন একটি বিষাক্ত এবং ক্যান্সার উৎপাদক রাসায়নিক পদার্থ। দুধ, ফল, মাছ, মাংসকে পচন থেকে রক্ষা করার জন্য অতি লোভী অসাধু ব্যবসায়ীরা না বুঝে ব্যবহার করে থাকেন। এর দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারে লিভার ও কিডনি নষ্ট হওয়া, ক্যান্সার, বদহজম, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, পেটের পীড়াসহ নানরকম জটিলতা দেখা দিতে পারে। মেয়েদের গর্ভপাত এমনকি সন্তান বিকলাঙ্গ পর্যন্তহতে পারে। যার পরিণতিতে যন্ত্রণাদায়ক অকাল মৃত্যু হতে পারে। ফরমালিন ব্যবহার খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অসততা ও অসচেতনতার কারণে ফরমালিনের ব্যবহার একটি মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি হিসেবে দেখা দিয়েছে।

ক্যালসিয়াম কার্বাইট : ফল বিশেষত কলা পাকানোর জন্য এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এটি একটি যৌগ যা জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে অ্যাসিটিলিন নামক গ্যাস উৎপন্ন হয়- যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। অ্যাসিডটলিন ইথিলিনের মতো ফল পাকাতে সাহায্য করে। অ্যাসিডটলিন ব্যবহার ঠিক নয়।

ইথিলিন (Ethylene) : ফল নিজেই ইথিলিন তৈরি করে এবং পাকতে সাহায্য করে। ফল সৃষ্ট ইথিলিনকে ফলের হরমোন বলা হয়। কিন্তু একসঙ্গে ফল পাকাতে সারা বিশ্বে ইথিলিন গ্যাস ব্যবহার করা হয়। তখন ইথিলিনকে Ripeing agent বলা হয়। আমাদের দেশে অপরিপক্ক ফল পাকাতে ইথিলিন গ্যাস তৈরি করে ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করে। তাতে ফল সুমিষ্ট হয়। অতি অপরিপক্ক ফলে ইথিলিন ব্যবহার করা উচিত নয়। আম, কলা, পেঁপে, টমেটো ইত্যাদি পাকানোর জন্য ব্যবহার করলে অন্তত ৭-৮ দিন পর তা বাজারজাত করা উচিত।

কালটার (Culter) : এটি একটি হরমোন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ। গাছে থাকা অবস্থায় এটি আমে প্রয়োগ করা হয়। এতে ফল দ্রুত পরিপক্ক হয় অথচ না পেকেই দীর্ঘদিন গাছে থাকে। ফলে, ব্যবসায়ীরা ধীরে ধীরে বিক্রি করার সুযোগ পায়। কালটার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

খাদ্যে বিষাক্ত পদার্থ ব্যবহারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ

১। খাদ্যে বিষাক্ত পদার্থ ব্যবহারের পরিণতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা সর্বপ্রথম পদেক্ষপ হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে, রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র, লিফলেট, পোস্টার, মাইকিংসহ গণমাধ্যমগুলো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারে। বলাবাহুল্য যে, এ বিষয়ে ইতোমধ্যেই সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাৎপর্যপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

২। ভোক্তা আইন সম্পর্কে সচেতন করা এবং ভোক্তা আইন কঠোরভাবে পালন করার ব্যাপারে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা উচিত। এক্ষেত্রে সরকার গুরুত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করছে।

৩। আইন লঙ্ঘনকারী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এতে ব্যবসায়ীরা এ ধরনের অপরাধ ঘটাতে ভয় পাবে। আশার কথা যে সরকার এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে।

৪। খাদ্যে বিষাক্ত পদার্থ প্রয়োগের বিরুদ্ধে গ্রাম থেকে শহরে, ধনী-গরীব, শিক্ষিত অশিক্ষিত জনগণ থেকে জনপ্রশাসন সব পেশার মানুষের মধ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তবেই এ অভিশাপ হতে আমরা মুক্ত হতে পারবো।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার বাড়িতে আপনি কী কী উপায়ে খাদ্য সংরক্ষণ করেন তার বর্ণনা দিন।

যথাসম্ভব খাদ্যমূল্য বজায় রেখে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রায় অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করাকে খাদ্য সংরক্ষণ বলে। খাদ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী কম-বেশি সময়ের মধ্যেই খাদ্য আহার উপযোগী থাকে না বলে খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। অণুজীব, ছত্রাক, জীবাণু ইত্যাদির আক্রমণে খাদ্যের মধ্যে এনজাইম বা উৎসেচকের ক্রিয়ায় এবং নানা ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণে খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে খাদ্যে বিষক্রিয়া তৈরি হয়। তখন এ খাদ্য মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই জীবাণুর হাত থেকে খাদ্যকে রক্ষা করা, খাদ্যের পুষ্টিমূল্য বজায় রাখা, দুর্যোগ অবস্থায় খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, উদ্বৃত্ত খাদ্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা ইত্যাদি কারণে খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা একটি দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে বা কৌশল অবলম্বন করে খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়, যেমন তাপ প্রয়োগ, শুষ্ককরণ বা রোদে শুকানো রেফ্রিজারেশন, ফ্রিজিং বা বরফে জমানো, Preservative বা সংরক্ষক দ্রব্য প্রয়োগ, চিনি ও লবণের দ্রবণে সংরক্ষণ ইত্যাদি। ইদানিং কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে আসছে যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। জনসচেতনতা, সামাজিক আন্দোলন এবং আইনের কঠোর প্রয়োগ ও অপরাধীর শাস্তি কার্যকর করাই পারে এ সমস্যা হতে জাতিকে রক্ষা করতে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণ কোনটি?

ক) মশা-মাছি খ) জীবাণু

গ) তেলাপোকা ঘ) ইঁদুর

২। খাদ্য নষ্ট হওয়ার প্রভাববিস্তারকারী বিষয় হলো-

i) তাপ

ii) আর্দ্রতা
iii) অম্লতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। খাদ্য সংরক্ষক দ্রব্য বা Preservative কোনটি?
ক) ফরমালিন খ) ভিনেগার ও সোডিয়াম বেনজয়েট
গ) কাটার ঘ) ইথিলিন বা Ripening agent

৪। ক্যালসিয়াম কার্বাইড কী কাজে অপব্যবহার হয়?
ক) খাদ্য সংরক্ষণের কাজে
খ) ফল পাকানোর জন্য
গ) দুধ, ফল, মাছ, মাংসের পচন রোধের জন্য
ঘ) ফল দীর্ঘদিন ধরে গাছে রাখার জন্য।

পাঠ-১.৯ মাদকদ্রব্য ও এর প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাদকদ্রব্য বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মাদকাসক্তির লক্ষণসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন;
- মাদকাসক্তির কারণসমূহ বলতে পারবেন;
- মাদকাসক্তি নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মাদকদ্রব্য, মাদকাশক্তি, ধূমপান

মাদকদ্রব্য বা ড্রাগ বর্তমান বিশ্বের বহু দেশের জন্য এক ভয়ানক সংকটরূপে দেখা দিয়েছে। মাদকাসক্তির কারণে যুব সমাজ অনেক ক্ষেত্রেই বিপদগ্রস্ত ও বিপথগামী হয়ে পড়ছে। তাই মাদক সম্পর্কে জেনে এর সর্বনাশা পরিণাম হতে রক্ষা পেতে সবার মাঝে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরকে অভিভাবকদের অতি শাসন পরিহার করে বন্ধুসুলভ আচরণ করতে হবে। পিতা মাতার সাহচর্যহীন কিশোররা হতাশায় ভোগে। তাদেরকে সঙ্গ দেয়া পিতামাতার অত্যাবশ্যক কর্তব্য।

ড্রাগ বা মাদকদ্রব্য

ড্রাগ বা মাদক এমন এক ধরনের সেবনযোগ্য পদার্থ যা গ্রহণ করলে ব্যবহারকারীর স্বাভাবিক আচরণে পরিবর্তন ঘটে। মাদকের ক্রমাগত ব্যবহার মানুষের মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যে, মাদক গ্রহণ না করলে সে নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা অনুভব

করে। ফলে, সে এক সময় নিয়মিত মাদক গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। একে মাদকাসক্তি বলে। মানুষের উপর চরম আসক্তি সৃষ্টিকারী ড্রাগের নাম হলো হেরোইন। এছাড়া আফিম, আফিমজাত পদার্থ, মদ, ভাং, চরস, ম্যারিজুয়ানা, প্যাথিডিন, গাঁজা ইত্যাদি মাদকদ্রব্যও অত্যন্তক্ষতিকারক। এসব ড্রাগ বা মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়লে তার পরিণতি হয় ভয়াবহ।

মাদকাসক্তির লক্ষণ

মাদকাসক্তি ব্যক্তির আচরণ স্বাভাবিকের চেয়ে ভিন্নতর হয়। তাদের মধ্যে কতগুলো বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন-

১। খাওয়ার প্রতি আকর্ষণ কমে যাওয়া
২। যে কোনো কিছুতেই আগ্রহ হারানো
৩। ঘুম না হওয়া
৪। হতাশা
৫। কর্মবিমুখতা
৬। দৃষ্টিতে অস্বচ্ছতা ও চোখ লাল হওয়া
৭। সবসময় এলোমেলো ও অগোছালোভাব
৮। নিজেকে সবার থেকে দূরে ও আলাদা রাখা
৯। অতিরিক্ত ঘাম হওয়া
১০। মনোযোগ নষ্ট হওয়া ইত্যাদি।

মাদকাসক্ত ব্যক্তি হলে মাদকের খরচ যোগাতে গিয়ে অনেকেই পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে টাকা চুরি করে অথবা বাড়ির কোনো মূল্যবান দ্রব্য চুরি করে বিক্রি করে দেয়। বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে টাকা ধার করে হলেও মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদকের খরচ যোগড় করতে চায়। আসক্তি চরম পর্যায়ে পৌঁছালে আসক্ত ব্যক্তি মাদকের টাকা যোগাড় করতে আপনজনকে খুন করতে পর্যন্তদ্বিধা করে না।

মাদকাসক্তির কারণ

বাংলাদেশে যেকোনো ধরনের মাদক গ্রহণ, ক্রয় এবং বিক্রয় নিষিদ্ধ হলেও কিছু সংখ্যক উঠতি বয়সের তরুণ-তরুণী মাদকাসক্তে জড়িয়ে পড়ছে। সাধারণত কৈশোর এবং তারুণ্যেই ছেলেমেয়েরা অধিকহারে মাদকের গ্রাসে পরিণত হতে দেখা যায়। এর পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে, যেমন-

সামাজিক কারণ

১। মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা
২। বেকারত্ব
৩। অপরাধপ্রবণ এবং অসামাজিক কার্যকলাপ সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাস বা যাতায়াত
৪। ভিডিও, সিনেমা, সিরিয়ালের প্রভাব ইত্যাদি।

পরিবারিক কারণ

১। মা-বাবার অতিরিক্ত প্রশ্রয় বা যত্নহীনতা অথবা স্নেহ ভালবাসার ঘাটতি, সন্তানকে প্রয়োজনীয় সঙ্গ না দেয়া
২। একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা
৩। মানসিক অশান্তিও হতাশা
৪। পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা
৫। অসৎ সঙ্গ ইত্যাদি।

মাদকাসক্তি নিয়ন্ত্রণের উপায়

একবার মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে তা থেকে মুক্তি পাওয়া বেশ কঠিন। এক্ষেত্রে মাদকাসক্ত ব্যক্তির সদিচ্ছা ও সহযোগিতা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়। এর চিকিৎসা করার জন্য মাদক নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করিয়ে অত্যন্তসহানুভূতির সাথে চিকিৎসা করতে হয়। ব্যক্তিকে মাদক গ্রহণকারী সঙ্গীদের থেকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন করতে হবে। কোনোভাবেই সে যেন মাদক হাতে না পায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এরপর মানসিক চিকিৎসা বা কাউন্সিলিং প্রয়োজন হয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে কোনো কাজে যুক্ত করতে পারলে অথবা মাদক গ্রহণকারী সঙ্গীদের থেকে আলাদা করতে পারলে যাতে সে

কোনোভাবেই মাদক হাতে না পায়, তাহলে ব্যক্তির দ্রুত আরোগ্য লাভ সম্ভব হয়। তবে, মাসদকাসক্ত ব্যক্তির মাদক গ্রহণ একবারে বন্ধ করা যায় না। ধীরে ধীর মাদকের মাত্রা কমিয়ে রোগীকে সম্পূর্ণ মাদকের নেশামুক্ত করা হয়।
মাদক যাতে জনসমাজে সহজলভ্য না হয় সেজন্য সরকার তথা প্রশাসনকে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করতে হবে। মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে মাদকের বিষাক্ত ছোবল থেকে মানুষকে বাঁচানো সম্ভব।

ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব

তামাক পাতা থেকে বিড়ি, সিগারেট ও চুরুট বানানো হয়। এগুলো পুড়িয়ে তার ধোঁয়া সেবনকে ধূমপান বলে। ধূমপান করলে নিকোটিন নামক পদার্থ বের হয় যা মাদকদ্রব্য হিসেবে সাময়িকভাবে নার্ভকে বা স্নায়ুকে উত্তেজিত করে ও ক্রমে নেশার সৃষ্টি করে। ধূমপানের ফলে-

১। রক্তের হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন বহনক্ষমতা কমে যায়
২। ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্তহতে পারে
৩। ঠোঁট, মুখ, গলা ও মূত্রথলির ক্যান্সার হতে পারে
৪। ব্রংকাইটিস হতে পারে
৫। হৃদরোগে আক্রান্তহতে পারে
৬। পাকস্থলীতে ক্ষত হতে পারে
৭। রক্তঘটিত রোগ হতে পারে
৮। অধিকাহারে ধূমপায়ীদের আয়ু কমে যায়
৯। নানা ধরনের রোগে আক্রান্তহওয়ার আশংকা বাড়ে
১০। ধূমপায়ীদের আশেপাশের মানুষের ক্ষতি বেশি হয়

ধূমপান নিয়ন্ত্রণের উপায়

১। গণপরিবহন, উন্মুক্ত ও খোলা স্থানে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ আইনটি যথাযথভাবে পালন করতে হবে।
২। তামাক সেবনের বিরুদ্ধে জনসচেতনা গড়ে তুলতে হবে।
৩। ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে সব পেশার, শ্রেণির মানুষের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকায় মাদকাসক্তি ও ধূমপান প্রতিরোধ কী কী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে তা পরিকল্পনা করুন।

সারাংশ

মাদক দ্রব্যে আসক্তি মাদকগ্রহণকারীর আচরণে নেতিবাচক পরিবর্তন আনে। হেরোইন, কোকেন, মদ, ভাং, চরস, ম্যারিজুয়ানা, প্যাথিডিন, আফিম ইত্যাদি ড্রাগ বা মাদকদব্যে আসক্ত হয়ে পড়লে, অরুচি, সব কিছুতে অনাগ্রহ, হতাশা, কর্মবিমুখতা, অমনোযোগ, ঘুম না আসাসহ বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়। দেখা গেছে যে, বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক কারণে তরুণ সমাজ মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে। মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করে এ ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে তরুণ ও যুব সমাজকে রক্ষা করা আমাদের সবার দায়িত্ব। মাদকের পাশাপাশি ধূমপানও অত্যন্তক্ষতকর নেশা। সব ধরনের আসক্তি ও নেশা থেকে সচেতনভাবেই সবাইকে দূরে থাকতে হবে। মাদকাসক্তি কমানোর জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি মাদকাসক্তির লক্ষণ নয়?
ক) খাওয়ার প্রতি আগ্রহ কমে যায়

খ) কর্মবিমুখতা
গ) ঘুম না হওয়া
ঘ) নিজেকে সবার মধ্যে মিশিয়ে রাখা

২। মাদকাসক্তি নিরাময়ের জন্য প্রয়োজন-
i) নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি
ii) কড়া শাসন
iii) মানসিক চিকিৎসা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব কোনটি?
ক) ফুসফুসে ক্যান্সার খ) ত্বক ক্যান্সার
গ) বদ হজম ঘ) এলার্জি

৪। মাদকাসক্তি ও ধূমপান প্রতিরোধে প্রয়োজন-
i) জনসচেতনা বৃদ্ধি
ii) কঠোর আইন প্রয়োগ
iii) সন্তানদের হাতে টাকা পয়সা না দেয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.১০ এইডস ও স্বাস্থ্যরক্ষায় শরীরচর্চা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- এইডস কী তা বলতে পারবেন;
- এইডস রোগের কারণ উল্লেখ করতে পারবেন;
- এইডস সংক্রমণ কীভাবে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- স্বাস্থ্যরক্ষায় শরীরচর্চার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	এইডস (AIDS), HIV, স্বাস্থ্যরক্ষা, শরীরচর্চা

মরণব্যাধি এইডস (AIDS) এর নাম আমরা প্রায় সবাই শুনেছি। অনিরাময়যোগ্য এ রোগ সম্পর্কে আমাদের সবার জানা উচিত। কেননা অজ্ঞতা ও অসচেতনতাবশত এমন কোনো পদক্ষেপ কারো নেয়া উচিত নয় যা তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। তাই, এ পাঠে এইডস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এইডস (AIDS)

এইডস একটি সংক্রমক রোগ। এ রোগে আক্রান্তব্যক্তির নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আক্রান্তব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। এইডস হলো Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) ১৯৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম এইডস রোগ শনাক্ত হয়। তবে, আফ্রিকার দেশগুলোতেই এর প্রকোপ বেশি।

মানবদেহের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি থাকে। Human Immune Deficiency Virus (HIV) নামক ভাইরাসের আক্রমণে দেহের এই স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে শরীরে নানা ধরনের রোগ যেমন- শ্বাসতন্ত্রের রোগ, মস্তিষ্কের রোগ, পরিপাকতন্ত্রের রোগ, টিউমার ইত্যাদি হয়। এইডস এর চিকিৎসা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তাই একে মরণব্যাধি বলা হয়।

এইডস সংক্রমণ

এইডস যেহেতু সংক্রমক রোগ সেহেতু এ রোগ এক দেহ হতে অন্য দেহে সংক্রমিত হয়। অর্থাৎ এইডস রোগীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে আসলে অন্য ব্যক্তিরও এইডস হতে পারে। বিভিন্নভাবে এইডস সংক্রমিত হয়; যেমন-

১। এইডস-এর জীবাণু একজন মানুষের দেহে সুপ্ত অবস্থায় দীর্ঘদিন থাকে এবং বায়ু সংস্পর্শে অতি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়।
২। যৌন ক্রিয়ার মাধ্যমে আক্রান্তব্যক্তির দেহ হতে HIV সুস্থ দেহে প্রবেশ করে।
৩। এইডস আক্রান্তগর্ভবতী মায়ের গর্ভের সন্তানের মধ্যে HIV সংক্রমিত হতে পারে।
৪। এইডস আক্রান্তস্তন্যদানকারী মায়ের দুধ হতে নবজাতকের দেহে HIV সংক্রমিত হতে পারে।
৫। এইডস আক্রান্তব্যক্তির রক্তের মাধ্যমে ও সিরিঞ্জের সাহায্যে ড্রাগ ব্যবহারকারী অন্যান্য ব্যক্তির দেহে HIV সংক্রমিত হতে পারে।
৬। রক্ত, বীর্য, লালা ও অশ্রুর মাধ্যমে এ রোগ অসুস্থ দেহ হতে সুস্থ দেহে সংক্রমিত হতে পারে। HIV আক্রান্তব্যক্তি মাদকদ্রব্য গ্রহণ করলে এইডস দ্রুত সংক্রমিত হতে পারে।

এইডস আক্রান্তব্যক্তিদের সমাজচ্যুত না করে তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। একথা মনে রাখা দরকার যে, খাদ্য, পানি, কীটপতঙ্গ বা রোগীর সাধারণ স্পর্শের মাধ্যমে এ রোগ সংক্রমিত হয় না।

স্বাস্থ্য রক্ষায় শরীরচর্চা

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। আর এই স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখতে হলে খাওয়া, ঘুম ও বিশ্রামের পাশাপাশি প্রয়োজন নিয়মিত শরীরচর্চা। কারণ শরীরচর্চা মানবদেহের স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ ঘটায়। শরীরের অভ্যন্তরের বিভিন্ন ক্রিয়া যেমন-পরিপাক, রক্ত সঞ্চালন, পচন, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া, শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে সক্রিয় রাখার জন্য প্রয়োজন পরিমিত মাত্রায় শরীরচর্চা। তাই আমাদের উচিত বয়স, দৈহিক গঠন, শারীরিক অবস্থা, লিঙ্গ প্রভৃতি দিক বিবেচনা করে নিয়মিত শরীরচর্চা বা ব্যায়ামের অভ্যাস করা। আমরা জানি যে, সুস্বাস্থ্য মানে সুস্থ মন ও সুস্থ দেহ। নিয়মিত ব্যায়াম একইসঙ্গে আমাদের শরীর ও মনকে সতেজ ও প্রফুল্ল রাখে। সাঁতার, হাঁটা, দৌড়ানো, দড়ি খেলা, জগিং ইত্যাদি সাধারণ ব্যায়াম ছেলে ও মেয়ে উভয়ের পক্ষেই করা সহজ। এছাড়া, টেনিস, গোল্লাছুট, কাবাডি, ব্যাডমিন্টন, হকি, ফুটবল, ইত্যাদি খেলাও শরীরের জন্য খুব ভালো ব্যায়াম হতে পারে।

শরীর ও মনের বিশ্রাম

শারীরিক পরিশ্রম করার পর শরীরকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রেখে আরাম করাকে দৈহিক বিশ্রাম বলে। একইভাবে মানসিক ক্লান্তি, অবসাদ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, অশান্তিকাটানোর জন্য মনেরও বিশ্রাম প্রয়োজন হয়। ঘুম হলো দেহ ও মনের শ্রেষ্ঠ বিশ্রাম। দেহও মনকে সতেজ ও সচল রাখার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক কমপক্ষে ৬ ঘন্টা ঘুমানো প্রয়োজন। বালক-বালিকাদের ৮-১০ ঘন্টা এবং শিশুদের দৈনিক ১০-১২ ঘন্টা ঘুমানো উচিত।

ঘুম ছাড়াও আমরা নানাভাবে বিশ্রাম নিয়ে থাকি। কঠোর পরিশ্রমের পর চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা থাকলে সেটিও এক ধরনের বিশ্রাম হয়। অনেক সময় বহুক্ষণ ধরে এক কাজ করতে থাকলে শরীর ও মন ক্লান্তহয়ে পড়ে। তখন অন্য কোনো কাজ যেমন-বাগান করা, পশুপাখি পালন, মাছ পালন, টিভি দেখা, গান শোনা ইত্যাদি করে কাজের থেকে বিশ্রাম নেওয়া যায়। একে কর্মান্তরের মাধ্যমে বিশ্রাম গ্রহণ বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনারা দৈনন্দিন জীবনকে কাজ, ঘুম, বিশ্রাম, শরীরচর্চা ইত্যাদি অংশে কীভাবে বিন্যস্ত করবেন তার একটি ছক প্রস্তুত করুন।

এইডস রোগে আক্রান্তব্যক্তির নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। সংক্রামক ব্যধি এইডস এর পরিণতি একমাত্র মৃত্যু। HIV নামক ভাইরাসের আক্রমনে এ রোগ হয়। যৌন ক্রিয়া, গর্ভবর্তী মায়ের মাধ্যমে গর্ভের শিশুর, স্তন্যদানকারী মায়ের মাধ্যমে স্তন্যপানকারী শিশুর এবং এইডস রোগীর সাথে একই সিরিঞ্জ ব্যবহারকারীদের এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে। এছাড়া, লালার মাধ্যমেও HIV ভাইরাস আক্রান্তদেহ হতে সুস্থ দেহে সংক্রমিত হয়। স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য শরীরচর্চা একটি অনন্য পন্থা। সবারই উচিত শরীরচর্চা বা ব্যায়মের মাধ্যমে শরীর ও মনকে সতেজ ও প্রফুল্ল রাখা। শরীর সুস্থ রাখার জন্য খাওয়া ও কাজের পাশাপাশি বিশ্রাম গ্রহণও অত্যন্তজরুরী। শরীর ও মনের প্রয়োজনীয় বিশ্রাম মানুষকে পরবর্তী কাজের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। AIDS অর্থ কী?

ক) Acute Immunity Deficiency Syndrome
খ) Acquired Immunity Deficiency Syndrome
গ) Acutired Immunity Deficiency System
ঘ) Acquired Immunity Deficiency System

২। HIV অর্থ কী?

ক) Human Immunity Deficiency Virus খ) Higher Immunity Deficiency Virus
গ) Human Immunity Virus ঘ) Human Immuno Virus

৩। HIV সংক্রমিত হয় না কীসের মাধ্যমে?

ক) যৌন ক্রিয়া খ) বুকের দুধ
গ) রক্ত ও লালা ঘ) খাদ্য ও পানীয়

৪। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির একদিনে কমপক্ষে কত ঘন্টা ঘুমানো উচিত?

ক) ১০ ঘন্টা খ) ৮ ঘন্টা
গ) ৬ ঘন্টা ঘ) ৪ ঘন্টা

চূড়ান্তমূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জয় ও কলি দুই বন্ধু একসাথে চাকরি করে। বিজয়ের ওজন ৬০ কেজি, উচ্চতা ১৭ মিটার। জয় সুস্থ থাকলেও কলি প্রায়ই অসুস্থ ও দুর্বল বোধ করে। চিকিৎসক বললেন কলি খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে সব ধরনের খাদ্য গ্রহণ করার অভ্যাস করতে হবে।

ক) সুষম খাদ্য বলতে কী বোঝায়? ১
খ) তাপ ও শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য বলতে কী বোঝায়? উদাহরণ দিন। ২
গ) জয়ের ভরসূচি বা বিএমআই নির্ণয় করুন। ৩
ঘ) কলির জন্য খাদ্য পিরামিড তত্ত্ব ব্যবহার করে একদিনের দুপুরের সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করুন। ৪

২। ছোট অরিত্র বাবুর ১৪ মাস বয়স হওয়া সত্ত্বেও দাঁত উঠছে না। ডাক্তার তার মাকে বললেন, বেশি দুধ, ডিম, ছোট মাছ খাওয়াতে। এছাড়াও ডাক্তার অরিত্রকে গাজর, মিষ্টি কুমড়া, পাকা পেঁপে খাওয়াতে বললেন।

ক) কোন খাদ্য উপাদানের অভাবে অরিত্রর দাঁত উঠতে দেরি হচ্ছে? ১

খ) শিশুর গঠন ও বৃদ্ধির জন্য কোন খাদ্য উপাদান প্রয়োজন? এর উৎস কী? ২

গ) ভিটামিন এ এর অভাবে অরিত্রর কী কী অসুবিধা হতে পারে? ৩

ঘ) শিশুর খাদ্য তালিকায় বড়দের তুলনায় কোন কোন খাদ্য উপাদান বেশি অনুপাতে প্রয়োজন হয়? ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১ : ১। খ ২। ঘ ৩। গ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২ : ১। ঘ ২। খ ৩। খ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩ : ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪ : ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫ : ১। খ ২। খ ৩। ক ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬ : ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৭ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। খ ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৮ : ১। খ ২। ঘ ৩। খ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৯ : ১। ঘ ২। খ ৩। ক ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১০ : ১। খ ২। ক ৩। ঘ ৪। গ